দিনের পর দিন

শ্রীবিমল মিত্র

--3rd graded author

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস

৮১১-এ, হরি পাল লেন : কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
কার্তিক ১৩৫২

মূল্য : দুই টাকা

শ্রীসত্যচরণ দাস কর্ত্তৃক ৯।এ, হরি পাল লেনস্থ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং
ওয়ার্কস্‌-এ মুদ্রিত ও ৮।১এ, হরি পাল লেন হইতে প্রকাশিত

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্‌বরেষু

দিনের পর দিন

বিগত বসন্ত

দেবরাণীর সাধ

ক্রিয়াকাণ্ড

বিষ

শত্রু আসছে আবার

মরা পাখীর পালক

রঙ্গিলা নায়ের মাঝি

প্রেম নয়

দিনের পর দিন

বাহান্নটি পরিবারের মধ্যে আমরা একটি। এত বড় বাড়ী; দু'মাইল দূর থেকে দেখা যায় বাড়ীটাকে। সারি সারি জানালা দরজার মিছিল—ধর্ম্মশালার কথা মনে করিয়ে দেয়। বাহান্নটি পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বাড়ীওয়ালাকে নজর রাখতে হয়েছে। ইঞ্চি মেপে অঙ্ক করে ঘর-গুলো তৈরী—অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু যদি একটু আধটু কষ্ট হয় তো সে বাড়ীওয়ালার দোষ নয়—দোষ আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার।

অফিস থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে পাড়ার খবর পাই।

—তেরো নম্বরের ফ্ল্যাটের ঘোষালবাবুর বউ নাকি দ্বিতীয়পক্ষের—বুঝলে—আমি তো অত জানি না। আজ দুপুরবেলা যে ওরা এসেছিল। শান্তিপুরের মেয়ে, কথা দেখেই ধরেছি—ভাজনঘাটে ওদের মাসশ্বশুর থাকে। শাশুড়ী পাকা লোক; বললে,—আমার প্রথম বউমা ছিল মাটির-মানুষ, সে শান্তিপুরের মেয়ে—এবারও ওই শান্তিপুরেই ছেলের বিয়ে দিলাম।—আমার বোনের শান্তিপুরে বিয়ে হয়েছে শুনে বউটি অনেক কথা বললে—

সিঁড়ীতে উঠতে উঠতে একদিন হঠাৎ অপরিচিত লোকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ি।

আশুবাবু কোন্ ফ্ল্যাটে থাকেন—বলতে পারেন?

নতুন নতুন লোক—নতুন পরিস্থিতি। কা'কেও চিনতে পারার সুযোগ পাওয়া যায় না। গরুর গাড়ী-বোঝাই লরী-বোঝাই জিনিষপত্র এসে নামে এক দরজায়—আর এক দরজায় মাল-বোঝাই মানুষ-বোঝাই হয়ে

গাড়ী গেটের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায়। কতদিন মধ্যরাত্রে মানুষের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে। যে ঘরে সন্ধ্যেবেলা হারমোনিয়মে গলা মিলিয়ে মিহি গান শুনেছি—মধ্যরাত্রে সেই ঘরেই মৃত্যুর সংবাদ শুনে চম্‌কে উঠতে হয় বৈকি !

তিনতলার স্নেহ এসে বলে—খবর শুনেছ বৌদি—

বৌদি রান্নাঘরে রাঁধছিল। বললে,—কী খবর, শুনিনি তো—

—ষোল নম্বরের সেই মেয়েটার বিয়ে হোল না সেদিন—কাল রাত্তিরে তার বর এসেছিল—মদে একেবারে চুর হয়ে এসেছে—এরাও ঢুকতে দেবে না—সে-ও ঢুকবে—কাল রাত্তিরে তাই অত হৈ চৈ হচ্ছিল—আজ টের পেলুম—

আমাকে এসে বলে,—দাদা, আবার আপনি চেয়ারের ওপর ভিজে গামছা রেখেছেন—আমাদের বাড়ীতে আমি করলে বাবা আমারই পিঠে দুম্ দুম্ করে কিল বসিয়ে দিত—আচ্ছা দাদা—

বললাম,—কী বল—

—বায়স্কোপে যদি আমি প্লে করি আমাকে কি নেবে ? আজকাল তো সবাই করছে—বেশ চারদিকে খুব নাম হবে—আমি তো গান জানিই—

অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি রোদে এসে স্নানটা সেরে নিলাম। এক ফালি রোদ অনেক কসরৎ করে বারান্দায় এসে পড়েছে। মোড়ের ছোট পানের দোকানটা এখান থেকে দেখা যায়—দোকানের সামনে একটা টিয়াপাখী খাঁচায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাতে ওই পানওয়ালাটাই গান গায়। পাশেই এ-বাড়ীর দরোয়ানের ঘর। খড়ম পায়ে দিয়ে খট্ খট্ করে হাঁটে—সশব্দে মন্তর পড়তে পড়তে স্নান করে—আর. মাসকাবার হলে বাড়ীভাড়ার টাকা চাইতে আসে

দিনের পর দিন

নিত্যকার জীবন এখানে সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে—সামনের বাড়ীটার আওতায় দৃষ্টিও প্রসার পায় না। বাঁধাগতি পা দুটো অফিস থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে ছুটে আসে—ঘরে এসে বুঝি তা'রা সাময়িকভাবেও পঙ্গু হয়ে যায়। তবু এই আবহাওয়ায় অফিস যাওয়ার সময় দেখি—স্নেহলতা হাইহিল জুতো পরে মেয়ে-স্কুলের গাড়ীতে গিয়ে উঠলো—পাউডার আর স্নোর গন্ধ নাকে এসে লাগে।

স্ত্রী বলেন,—বড় পিসীমা পাঁচটা টাকা চাইতে এসেছিলো, দেবো?

সুরেনবাবুর স্ত্রী বয়সে অনেক বড়—এ-বাড়ীব পুরোনো বাসিন্দা। সবাই বলে বড় পিসীমা। নিরুপমাও.শিখেছে। লাঠি হাতে টুকটুকে রাঙা বালাপোষটি গায়ে দিয়ে সুরেনবাবু বিকেলবেলা বেড়াতে বেরোন। দেখা হলে নমস্কার করি। একেবারে পরমাত্মীয়ের মত দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন,—নিরুপমা ভাল আছে—দেশের খবর ভাল—

তারপর যেখানে যত কেউ আছে তাদেব সকলের সুসংবাদ গ্রহণ করে তবে রেহাই দেন।

কতবার দেখেছি বাজার থেকে দুটো আনারস—লিচু—কি আপেল—সুদৃশ্য মুখরোচক দু'একটি জিনিষ হাতে করে নিয়ে বাড়ী ফিরছেন। সুস্থ সুন্দর মানুষটি—কোথাও এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি নেই। হঠাৎ বড় পিসীমার টাকা চাওয়াতে মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। নিজের বিশ্বাসেরও ওপর আর শ্রদ্ধা নেই দেখছি—

ট্রামে উঠে সেই কথাই ভাবছিলাম। ঘোষালবাবুর ছেলেমেয়েরা টাকার অভাবে ইস্কুলে পড়তে পায় না—সারা দুপুর পাড়ায় চীৎকার করে খেলা করে—সেই ঘোষালবাবু দেখি ট্যাক্সি চড়ে সস্ত্রীক সিনেমায় যান নিয়ম করে। যাদের বাড়ীর ছেলেরা খালি পায়ে টো টো করে

বেড়ায়—সেই ঘোষালবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর পায়ে জুতোর বৈচিত্র্য।

ভাবছিলাম—নিরুপমার বড় পিসীমাকে পাঁচ টাকা ধার দেওয়া যায় কি না। নিজের অবস্থা-বিপর্যায়ে অনেকবার ধার করেছি—অফিস থেকে। বন্ধুদের কাছেও যে করিনি তা নয়। কিন্তু ধার চাইতে যে সঙ্কোচ, যে লজ্জা, যে হীনতা বোধ করেছি—তা কখনও ভুলিনি। কিন্তু সে লজ্জা কি এদেরও হয়—সে সঙ্কোচ কি এদেরও বিব্রত করে? হয়ত করে—হয়ত করে না; ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম।

সেদিন আরেকটি অপরিচিত লোকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম—

—আশুবাবু কোন্ ফ্ল্যাটে থাকেন—বলতে পারেন?

কৌতুহল হোল। বললাম,—কেন বলুন তো—

—শ'দুয়েক টাকা ধার করেছেন—যে ঠিকানা দিয়েছেন—সে ঠিকানাই এ-বাড়ীতে নেই—

ভাবলাম—তা' হলে আশুবাবু বলে কোনও লোক নেই। বাহান্নটা পরিবার—যে-কোন একটির আড়ালে আত্মগোপন করা শক্ত নয়।

অফিস থেকে আসছি, বাড়ীর সামনে ভীড় দেখে থম্‌কে গেলাম। উত্তেজিত ভীড়। আস্ফালন আর চীৎকারে বিরাট বাড়ীটার চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। চিন্তিত হলাম। নিশ্চয় কোন গুরুতর পরিস্থিতি। ওপরতলার লোকগুলি নীচের দিকে চেয়ে, আর নীচের লোকগুলি ওপরের দিকে হাত তুলে বিবাদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে তুলছে।

শান্তিপ্রিয় মানুষ—একান্তে পাশ কাটিয়ে চলে আসবো ইচ্ছে ছিল। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর কাছেই খবরাখবর পাবো। কেমন করে জানি না

মেয়েদের কাছে সব খবরই আসে। কিন্তু বাধা পেলাম ঘোষালবাবুর কাছে—

—আপনাদের কী মশাই, থাকেন ওপরতলায়—নীচে থাকার কষ্টটা বোঝেন না তো—

শুনলাম ওপর থেকে কেউ কলার খোসা ফেলাতে নীচের বাসিন্দাদের কোনও ছেলে তাইতে পিছ্‌লে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়েছে। তারপর অভিযোগ উঠেছে ওপরতলার সব ক'টি বাসিন্দার নামে—তারা নাকি এতাবৎকাল নানান্ জিনিষ ওপর থেকে নীচে ফেলে থাকেন—দুর্ঘটনা আগেও যে ঘটেনি এ কেবল দৈবের অনুগ্রহ।

ভাবি : নীচের লোকদের চিরদিনই ওপরওয়ালার দুর্ব্ব্যবহার সইতে হয়েছে—সে কেবল নীচের লোকদের নীচে থাকবার দোষে।—এ এমন নতুন কথা কী!

পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে যায়, তারপর একদিন কে কোথায় চলে যায় খোঁজ রাখবার দায়িত্ব নেই—মন্দ কি!

ক'দিন ধরে নীচেকার একটি ফ্ল্যাট খালি পড়ে ছিল। একদিন দেখি গরুর গাড়ী-বোঝাই মালপত্র এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। সস্তা ভাড়ার ফ্ল্যাট ওটা। বাসিন্দা ওটাতে থাকে আবার থাকেও না। খালি থাকবার অগৌরবই ওকে বইতে হয়।

নতুন লোকের আগমনে আবার গুঞ্জন সুরু হোল।

তৃতীয় দিনেই পরিচয়। একেবারে আমাদেরই বাসায়। নিরুপমার কাছে যারা সেলাই শিখতে আসে বউটি এল তাদের সঙ্গেই।

অবস্থা সকলেরই সমান। রান্নাঘর আর শোবার ঘরের আয়তন বাঁধা

—হিংসা করবার অভিযোগ করার পন্থা নেই। পন্থা আছে স্বামীদের অবস্থার আর ছেলেমেয়েদের সংখ্যার তারতম্যে।

সেলাই হয় সামান্য—গল্পই বেশী।

পনেরো নম্বরের গিন্নী বলেন,—দু'নম্বরের বউ-এর কিত্তি শুনেছ বৌমা—

—কিছু শুনিনি তো মাসীমা—

—শোননি তো শুনে কাজ নেই বাছা, ও শুনলেও পাপ—ওই বউ-এরই আবার সোহাগ কত—বাপের বাড়ী যাবার নাম করে কোথায় গিয়েছিল মা ভগবানই জানেন—কত্তা আবার ধরে নিয়ে এসেছে—সেদিন রাত্তির বেলা মটরের শব্দ হোল—রাত্তির বেলা দরজার পাশে কান পেতে শুনি কত্তা শুধু পায়ে ধরতে বাকি রাখলে—ছিছি—ভদ্রলোকের পাড়ায় আমাদের নাম ডোবাবে মা—ও না শোনাই ভাল—ছিছি—

নিরুপমা শোনে—সকলেই শোনে। পাশের ঘর থেকে আমারও কানে আসে।

—নতুন চুড়ি ক'গাছা হাতে দেখছিনে বৌমা—বাঁধা রেখেছ বুঝি—ওই ছটুলালের কাছে আমারও তিন সেট গয়না বাঁধা আছে আজ দু'বছর—ওঁকে বলি তাই—টাকা যখন রয়েছে নাওনা ছাড়িয়ে—উনি বলেন,—থাক না, ও-সব পুরোনো প্যাটার্নের গয়না, কাজে সে আর লাগবে না—

—না বাঁধা রাখিনি—তুলে রেখেছি—কাজ করতে হয়—খারাপ হয়ে যাবে, কোথাও এলে-গেলে তখন—

ভাল করেছ বৌমা, আমার ছোট মেয়েকে তাই বলি—দেখে আয় তোর বৌদিকে—বাঁজা মানুষ বটে, কিন্তু সৌখিন কেমন—জিনিষপত্তর করলেই হয় না, রাখতে জানা চাই।

আর একজন বলে,—তা সৌখিন যদি বল মাসীমা তো সে আমার পিস্‌তুতো বোন—পয়সা আছে হবে না কেন, শোভাবাজারের রাজারা আছেন। ওদেরই বাড়ীর বউ—তা এতটুকু দেমাক নেই—গাড়ী নিয়ে আমার কাছেই তো আসে প্রায়—ছোট ছেলেটাও হয়েছে মায়ের মতন—সিল্কের পাঞ্জাবী পরেই রান্নাঘরে বসে পড়ে, বলে—পান্তভাত খাব—বড়-মানুষের ছেলে—তা মাসীমা কত বড়লোকের সঙ্গেই তো মিশলুম—বড়-মানুষ হলেই মনও বড় হয়—

—হ্যাঁ মা, তুমি কিছু কথা বলছ না—

নতুন বউটি লজ্জায় আধমরা হয়ে যায়।

—তোমার স্বামী কী করেন মা—

—কত মাইনে পান ?

—শ্বশুরবাড়ীতে কে কে আছে ?

—তোমার বরের কি এই প্রথম বিয়ে ?

বাহান্নটা পরিবারের আস্তানা—তার চারগুণ লোক এ-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। বহুদিন থেকে দেখছি, বহু কথা কানে শুনেছি—এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হঠাৎ কোন জিনিষই বিস্মিত করে না। প্রত্যেকে আছি, দেয়ালের আড়ালে বিচ্ছিন্ন হয়ে—কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের বিচ্ছেদ হয় না—আমরা পরস্পরকে নিয়ে বাঁচি পরস্পরকে নিয়ে মরবার জন্যে।

পনেরো নম্বরের গিন্নী একদিন নিরিবিলিতে এলেন।

—হ্যাঁ বৌমা, ব্যস্ত আছ নাকি—না, অবেলায় আর বসবো না, কাজের কথাটা বলি—সাত তাড়াতাড়ি আবার কার কাছে যাবো বৌমা, ভাবলাম পাশেই যখন তুমি রয়েছ—তুমি ছাড়া মাসীমাকে আর কে-ই বা—

নিরুপমা বলে,—কী বলুন না—

বিপদ মা বিপদ—বড়মানুষের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া ঝকমারী—আমার সেই বড়বাজারে এক বোনঝি আছে বলেছিলুম—তারই মেয়ের বিয়ে—আমি তো বলেছিলুম যা আমার আছে তাই পরেই যাবো, তা উনি শুনবেন না, বল্লেন দু'দিনের জন্যেও নয়, দশ দিনের জন্যেও নয়—এক ঘণ্টার জন্যে চেয়ে নিয়ে পরে যাবে—তা'তে লজ্জা কি—তা মা লজ্জা করে না—বুড়ী মাগী হতে চললুম—

—তা কি চাই বলুন না—

—তোমার সেই নতুন চুড়ীর সেটটা আর সেই ঢাকাই শাড়ী—লজ্জাও করে বলতে—

—লজ্জা কিসের মাসীমা—

—বয়েস হোল তো—বুড়ী হতে চল্লাম—আমায় কি মানায়—ওঁর যে কী সখ—

এ-মানুষগুলিকে দেখলে দুঃখ হয় না, ঘৃণা হয় না, মমতা হয়। কলেজের জীবনের কথা মনে পড়ে। সে-মানুষগুলি আজ কোথায়? সরস্বতী পূজোর চাঁদার খাতায় যারা এক একটা আস্ত নোট দিয়েছে—সিগ্রেট্ বিলিয়েছে দু'হাতে—কলেজের দরোয়ানকে পূজোর বখশিস্ দিয়েছে দু'টাকা! তারাই কি সংসারের চাপে পড়ে এমন হয়েছে! এদের দেখে তো চেনা যায় না। নিজের ভাগ্যও এমন কিছু ফেরাতে পারিনি; মোটা মাইনেটা পাই—ছেলেমেয়ের ভীড় নেই—আর নিরুপমাও হিসেবী মেয়ে—নইলে নিজেকে তো আমি এদের ভীড়ে হারিয়ে ফেলতাম! সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়—প্রচুর প্রত্যাশা নিয়ে পরের দিনের সকালের দিকে চেয়ে থাকি, সেই একই পুনরাবৃত্তি, একই প্রাত্যহিকতায় বাঁধা জীবনের আবর্ত্তন। মন বিরস হয়ে ওঠে।

ছটুলালের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে থমকে গেলুম। এমন তো হয় না। দরোয়ানের আত্মীয় ছটুলাল, আজ বহুদিন থেকে এখানে বন্ধকী কারবার করে আসছে। ঘোষালবাবুর সঙ্গে কি তার হাতাহাতি বাধবে নাকি!

ঢুকলাম।

ছটুলাল এগিয়ে এল। বললে,—দেখুন বাবু, এই ঘড়িটা চোদ্দ টাকায় আমার কাছে আছে আজ সতেরো মাস—সুদে-আসলে দাঁড়িয়েছে আজ একুশ টাকায়—উনি আঠার টাকা এনে বলছেন—ঘড়ি দাও—

ঘড়িটা দেখলাম—বহুদিনের চেনা জিনিষ—মনটা চন্ চন্ করে উঠলো—

ঘোষালবাবু থামিয়ে দিলেন—তুই থাম্ বেটা,—বেটা ছোটলোক, ভদ্দ-লোকের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় জানে না—শুনুন, আপনি এসে গেছেন ভালোই হয়েছে—আপনাকেই বুঝিয়ে বলি—

ঘড়ির ইতিহাস শোনবার আগ্রহ ছিল না। মনে হোল নিরুপমাকে খবরটা না শোনালেই নয়। বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সমস্ত মনটা নিজেরও অজ্ঞাতে রি রি করে উঠলো। এমনও হয়।

নিরুপমাকে বললাম—সমস্ত কাহিনী—

—অথচ সেদিন সুরেশবাবু চাকরটাকে মেরে তাড়ালেন—চাকর চুরি করছে বলে—আর এদিকে চোরাই মাল বেচাকেনা বাঁধা রাখা পর্য্যন্ত চলছে—না নিরুপমা, এদের প্রশ্রয় দিলে আর চলবে না,—টাকা ধার চাইলেও দিতে পাবে না, কাউকে না, তোমার বড় পিসীমাকেও নয়—মাসীমাকেও নয়—

—কিন্তু আজই যে সকালে দু'টো টাকা ধার দিয়েছি—

—কাকে ?—বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

—নীচে যে নতুন ভাড়াটে এসেছে —ওদের, নতুন বউটিকে।

কিছু বলবার ছিল না।

নিরুপমা বললে,—তুমি কিছু মনে কোর না, সকাল বেলা কাঁদতে কাঁদতে এসে যে-রকম করে বললে—তুমি হলে, তুমিও না দিয়ে পারতে না।

—কানের গয়না খুলে দিতে এল—

শুনলাম আগে নাকি ওরা খোলার ঘরে ছিল। সেখানে রোজই অসুখ লেগে থাকতো, এবার যুদ্ধের জন্যে পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে বলে ওরা এখানে এসেছে। ছেলেটির বয়েস কম, অল্প মাইনের চাকরী করে, দেখে মনে হয়—সাধ আছে, সাধ্য নেই। ছেলেটি সকালবেলা বেরিয়ে যায়, আসে অধিক রাত্রে।

নিরুপমা ছোট মেয়েটিকে কোলে করে এনেছে।

—কে বল তো ?

বললাম,—তুমি না বলে দিলে কী করে জানবো ?

—নতুন বৌটির মেয়ে, দুধ খেতে পায় না তো, কী চেহারা হয়েছে দেখেছ ? আমাকে মা'র মত দেখতে কি না, মনে করেছে মা'র মতন দেখতে হলে সবাইকে মা বলতে হয়—আমি তোর কে রে খুকী ?

দুঃখের সংসারে জন্মেছে খুকী—তবু মেকী আদর আর খাঁটি আদর চিনতে পারে। আমি একটু আদর করতেই কেঁদে উঠলো।

নিরুপমা বলে,—ওরা না খেয়ে থাকুক এই বুঝি তুমি চাও—ঘরে গিয়ে একদিন যদি দেখো—এক একদিন এক কণা চাল পর্য্যন্ত থাকে না, এমনি অভাব ওদের।

অভাব নেই এমন সংসার দেখিনি। যুদ্ধের জন্যে পাঁচ টাকা

মাইনে যাদের বাড়ে তারা সে পাঁচ টাকা খরচ করে কেন? দোষ দেব কা'কে।

ওপরতলা থেকে স্নেহলতার গলা শুনতে পাই। হারমোনিয়ম বাজিয়ে তবলার সঙ্গে গান গায় আজকাল। কতকগুলি ছেলে দেখেছি তার সঙ্গে আসে। গানের মাষ্টার বিনা পারিশ্রমিকে গান শেখায়। গান শিখছে—হয়ত নাচও শিখছে। শিখুক—তা শেখাই রীতি। কিন্তু পারিশ্রমিক নেয় না কেন! এত উদারতা আমাব কাছে যেন মূল্যহীন মনে হয়। এত অপব্যয় আমার ভাল লাগে না।

স্নেহলতা আর গাড়ীতে ইস্কুলে যায় না। কাদের একটা মটর আসে—বেনী তুলিয়ে পাউডার স্নোব গন্ধ ছড়িয়ে স্নেহলতা যায়—বোধ হয় ইস্কুলে—বোধ হয় ইস্কুলে নয়!

সেদিন দেখা হতেই সুরেনবাবু জড়িয়ে ধরলেন দুই হাতে।

—চলুন আপনার বাসাতেই যাচ্ছিলুম—নিরুপমা ভাল আছে—দেশের খবর ভাল—

সকলের সংবাদ নেওয়া হলে জানালেন—বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ—আপনাকে আসতে হবে—তারপর ভেতরে ঢুকে নিরুপমাকে লক্ষ্য করে বললেন,—তুমিও এসো মা, নইলে তোমাদের বড় পিসীমা রাগ করবেন।

সেই সুন্দর সুস্থ আকৃতি—দেখেই মনে হয়—কোথাও একটুকু ফাঁক বা ফাঁকি নেই। রাঙা টুক্‌টুকে বালাপোষটি গায়ে জড়ানো। সৌন্দর্য্য আর স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। বাইরে থেকে দেখলে বড় আনন্দ হয়।

—কোথায় গো বৌ?......এই যে, কাজ আছে আবার, তাড়াতাড়ি বলে নি।—কী ঝঞ্ঝাটেই যে পড়েছি বৌ, কি বলবো, তোমার আগেকার পাঁচ টাকা আসছে মাসে দেবার কথা আছে তো। আর আজ হোল

গিয়ে এ মাসের তেইশে, আর পাঁচটা টাকা দাও তো বৌ, আসছে মাসে একেবারে দশ টাকা একসঙ্গেই দিয়ে দেব—

যাবার সময় আমার কাছে কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গীতে বলে গেলেন—আজ পাঁচটা টাকা আবার নিয়ে গেলুম—তুমি যেন বৌকে কিছু বোল না বাপু, হ্যাঁ—

ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি নিরুপমা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। রাত্রে শুয়ে হঠাৎ বলে,—খুকী কাঁদছে না? শুনতে পাচ্ছ?—যাই নিয়ে আসি—

বিছানা ছেড়ে উঠতে যায়। ধরে রাখি—তারপর ঘুম ভেঙে যায়। নিরুপমার সে স্বাস্থ্য আর নেই। যদি বলি—তোমার কী হোল বলো তো—নিরুপমা বলে,—কিছু ভাল লাগে না আজকাল। সত্যি নিরুপমার ভাল লাগবার কী-ই বা আছে। সেই দিনের পর দিন কদর্য্যতা আর গ্লানি, মিথ্যা আর লজ্জা! সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে মনও যেন ধূমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পঙ্কিল হয়েছে পৃথিবী, জীবন, আকাঙ্ক্ষা।

নিরুপমা বললে,—তোমাকে এতদিন বলিনি—নতুন বউটির স্বামী আজ বহুদিন হোল আর আসছে না; প্রথমে বলেছিল চাকরীর কাজে বাইরে গেছে—কিন্তু কতদিন হয়ে গেল, কই আসছে না তো? চিঠিও লেখে না, টাকা-কড়িও পাঠায় না, কী করে ওদের চলে বল তো?—ছেলেটা দুধের অভাবে খেতে পাচ্ছে না, আজই সকালবেলা এক বেলার মত চাল দিয়ে এসেছি—তুমি কিন্তু বকতে পাবে না, খুকীটার মুখ দেখলে আমি আর থাকতে পারিনে···

মনে হোল—কী প্রয়োজন এই অভাবের কাহিনী শোনবার। অভাব আছে, দুঃখ আছে, দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ সবই পৃথিবীতে আছে। আমার তা'তে

কী প্রয়োজন! আমি স্বার্থপর হতে চাই। তাই আমার ভালো। এই দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিবেশ ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাবো যেখানে কোনও আর্ত্তনাদ কানে আসবে না।

—সেদিন ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে পুলিশ এসে হাজির। নতুন ভাড়াটেদের বাড়ীর দরজা এসে ঘেরাও করলে।

নিরুপমার চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠলো।

—ওরা কিছু করেনি—মিছি মিছি ওদের নামে কেউ নালিশ করে এসেছে—ওগো তুমি একটু পুলিশকে গিয়ে বুঝিয়ে বল না, ওরা কিছু করেনি—ওদের ঘরে যে পুরুষ মানুষ কেউ নেই—খুকীকেও ধরে নিয়ে যাবে নাকি—

নিরুপমার সে কি অশ্রু-আচ্ছন্ন মুখ! মনে হোল ছাড়া পেলে বুঝি এখনি ও ওদের কাছে ছুটে যাবে—। চারিদিকে তখন লোক জমে গেছে; নিরুপমাকে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। নিরুপমা বালিশে মুখ গুজে কাঁদতে লাগলো।

নীচে গেলাম। যা শুনলাম তা'তে হতবাক্‌ হওয়া ছাড়া গতি কি? যেখানে চাক্‌রী করতো সেখানকার ক্যাশের টাকা ভেঙে পালিয়েছে। ভেতরে ঢুকে পুলিশ সব দেখলে। বউটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল—খুকীটা তার বিছানায় শুয়ে আঙুল চুষছে—চোখ দুটো বুজিয়ে চলে এলাম। কি আমার করবার ছিল।

নিরুপমাকে এসে ভেবেছিলাম মিথ্যে বলবো, কিন্তু খবর তো পাবে সবই।

—হ্যাঁগো, ওদের কি হবে? খুকীটা কি করছে দেখলে?

রাত্রে নিরুপমার জ্বর এল।

বড় ভাবনায় পড়লাম। জ্বরের ঝোঁকে চেঁচিয়ে ওঠে—ওই খুকী কাঁদছে—শুনতে পাচ্ছো—যাই আমি—নিয়ে আসি—

তারপর দিন জ্বর একটু কম্‌লো। মনে হোল, না এমন করে আর চলবে না। এমনি আবহাওয়ায় বাস করা আর যার কাছেই সম্ভব হোক্‌, আমার কাছে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

রাত্রে নিরুপমাকে বললাম—চল, এখান থেকে আমরা চলে যাই নিরু—

—কোথায় যাবে, অনেক দূরে?

বললাম—হ্যাঁ অনেক দূরে—এখান থেকে অনেক দূরে—

—আমি খুকীকে ছেড়ে থাক্‌বো কি করে?

সত্যি সত্যি কিন্তু সেবার যাওয়া হোল না। যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয় না কি? এমন করে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের নেশা লেগেছে। নিরুপমার দিকে চাওয়া যায় না। এমন করে তার স্বাস্থ্য খারাপ হোল কেন, কোনও প্রত্যক্ষ অসুখও তো নেই তার!

আরও বিস্ময়জনক খবর পেলাম তারপরে। স্নেহলতার গানের শব্দ অনেকদিন শুনতে পাইনি। মনে হোত হয়ত পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনায় ব্যস্ত। কিন্তু এমন হবে আশঙ্কা করিনি। খবরটা দিলেন ঘোষালবাবু—এ-পাড়ায় আর ভদ্দরলোকের বাস করা চললো না মশাই—তখনই জানতুম—অত স্নো-পাউডার মেখে কেউ ইস্কুলে যায়—ছিঃ ছিঃ—

আমারও খারাপ লেগেছিল—বিনা-পারিশ্রমিকে গান শেখানো—এ উদারতা আমার ভাল লাগেনি। সত্যি সমস্ত পরিবেশ যেন কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। নির্লজ্জতা, মিথ্যা আর ভণ্ডামির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা জীবন ধারণ করছি—তবু বিদ্রোহ তো করছি না। ওই ঘোষালবাবু

দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর পরে হয়ত আবার তৃতীয়পক্ষ গ্রহণ করবেন, রাঙা টুক্‌টুকে বালোপোষ জড়িয়ে স্বাস্থ্যবান সুরেনবাবু স্ত্রীকে দিয়ে হয়ত আর কা'রো বাড়ী টাকা ধার করতে পাঠাবেন—স্নেহলতার বোন বোধ হয় তেমনি করে স্নো পাউডার মেখে অন্য কোনও ছেলের কাছে বিনা-পারিশ্রমিকে গান শিখবে, ছটু্‌লালের কাছে হয়ত কত ঘড়ি, কত গয়না বাঁধা পড়বে—এ সব আমরা নীরবে মুখ বুজেই সহ্য করছি—সহ্য করবোও —আমাদের শান্তির এতটুকু ব্যাঘাত এরা ঘটাতে পারবে না ; এরা আমাদের গা-সহা হয়ে গিয়েছে—আমাদের নেশা ধরেছে।

কিন্তু এমন আবহাওয়াও একদিন বাধ্য হয়েই ছাড়তে হোল।

পাড়ায় বসন্ত সুরু হয়েছিল। একদিন বাহান্নটি পরিবারের এই বাড়ীতে এসে দেখা দিল। গৃহস্থ লোক হঠাৎ যাওয়া-আসা নড়াচড়া ভালবাসে না। তবু বসন্ত যখন দেখা দিয়েছে—এ-বাড়ীর দু'একটি লোকও বিদায় নিল। মুস্কিল হোল বাড়ীওয়ালার। তিনি হুকুম দিলেন —পাঁচ টাকা করে সকলের ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হবে। যারা চলে যাবার ব্যবস্থা করেছিল তারা রয়ে গেল, যারা চলে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। বসন্ত আসবে চলেও যাবে ! ওকে ভয় করলে চলে ? আপাততঃ পাঁচ টাকা ভাড়া কম্‌লো এটা কি কম কথা নাকি। যারা একদিন এই দোষ দেখত তারা উল্টো সুর ধরলে। দু'তিনজনের মৃত্যুর খবরও এল— যারা রইলেন তারা পূর্ণ উদ্যমে টিকে নিলেন। এই দুর্ভিক্ষের বাজারে যদি খাওয়া পরা মিলেছে মারী-ভয়ও হাসি মুখে এড়ানো যাবে !

পাঁচ বছরের পুরোনো বাসা কেবল আমি একলাই ছেড়ে এলাম। দশজনকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম—এবার একলাই বাঁচবো। সম্পূর্ণ একখানা বাড়ী ভাড়া করেছি।

বিগত বসন্ত

অফিস থেকে বেরিয়ে শশিকান্তর মনে হোল—মুক্তি! এতদিন পরে আজ তা'র মুক্তি এসেছে। অফিসের বড় গেটটা হাঁ করে রয়েছে। ওইখানে আর সকলের মত শশিকান্ত তা'র জীবনের সমস্ত কিছু আহুতি দিয়েছে—তার যৌবন, স্বাস্থ্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—সমস্ত! আর আজ? আজ থেকে তা'র মুক্তি! শশিকান্ত একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

মোড়ের মাথায় এসে শশিকান্ত শেষবারের মতো অফিসটার দিকে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলো। রংটা লাল—ওই লাল বাড়ীর ঘরে ঘরে কালো কালো লোকগুলি সারাদিন কী খাটুনিটাই না খাটে! ওই অফিসের চেয়ারে বসে কাজ করতে করতেই কত লোককে পাগল হয়ে যেতে দেখেছে শশিকান্ত—সত্যিকারের পাগল। ফাইলের ওপর একটা পাখীর ছবি এঁকে রেখেছে—এ-ও ঘটেছে। কিন্তু শশিকান্ত এই পুরো বিয়াল্লিশ বছর একভাবে একটানা কাজ করে এসেছে—নির্ভুল নিখুঁত। অফিসের লোকেরা বলত—বড়বাবু মানুষ নয়—মেসিন!

মোড়ের পানের দোকানটার কাছে এসে দাঁড়াতেই পানওয়ালা নিত্যকার নিয়ম মত দু'খিলি পান এগিয়ে দিলে—একটু চুন দিলে—একটু দোক্তা দিলে—বিয়াল্লিশ বছর ধরে দিয়ে আসছে, ভুল হবার কথা নয়!

শশিকান্ত জিগ্যেস করলে—আমার হিসেবটা—

হিসেব মেটানোর জন্যে পানওয়ালা ব্যস্ত নয়। বিয়াল্লিশ বছর ধরে বাবুকে পান দিয়ে আসছে—সকাল সন্ধ্যায়। হিসেব পড়ে থাকে আবার শোধও হয়। বললে—থাক্‌না বাবু—এক সময়ে দেখে রাখবো—না

থাকবে না—শশিকান্ত শুধু প্রতিবাদ করলে!—দরকার কী! জীবনে কারো কাছে দেনা নেই। দেনা করা অভ্যেস তার নয়। দেনা করতে ভয় করে। অফিস থেকে মাইনে এনে নিজের খরচ চালিয়েছে—নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে, দরকার হলে দেনা দিয়েছে, কিন্তু দেনা কখনও করেনি।

ব্যাগ্ থেকে এগার আনা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে শশিকান্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

এখান থেকেও অফিসটা দেখা যায়। সন্ধ্যে হচ্ছে। অফিসের লোকজন সব চলে গেছে পাঁচটায়! সকলের সঙ্গে শেষ বিদায় নিয়ে কয়েকটা কাজ সারতেই শশিকান্তের দেরী হোল। তা' দেরী একে বলে না! রাত্রে শুধু বাড়ীতে শোবার জন্যেই যেন আসা! রাত আটটা বেজেছে—ন'টা বেজেছে—দশটা বেজেছে—কাজের মধ্যে কতদিন শশিকান্ত ঘড়ি দেখতেও ভুলে যেত। অফিসের দরোয়ান এসে তবে তাকে সচেতন করে তুলেছে—তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেছে—রাত দশটা!

যাক্—এতদিনে মুক্তি।

চলতে চলতে মনে হোল—রাস্তার ফুট-পাথের এই পাথরগুলো পর্য্যন্ত তার চেনা। রাস্তার কোন মোড়ে—কোন পাথরটা ভাঙ্গা—আজ আট বছর ধরে ভাঙ্গা তা' শশিকান্ত জানে। এ-দোকানগুলো তখন এখানে ছিল না—এখানে ছিল বস্তি—তার পাশেই পোড়ো জমি—ওইখানে গরমের দিনে কতদিন ওই পাথরটাতে বসে শশিকান্ত জিরিয়ে নিয়েছে।

আর একদিনের কথা মনে আছে। বর্ষাকাল! তিন দিন ধরে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। অফিসে আসতে হয় কাপড় গুটিয়ে—এসে

জামা খুলে শুকোতে দিতে হয়—আবার বাড়ী যাবার সময় সেই জামা ভেজানো! সেই ভিজে জামা নিয়ে সাহেবের কাছে ফাইল নিয়ে যাওয়া—শশিকান্তর লজ্জা করতো! কিন্তু অফিসের কাজ তো বন্ধ থাকবে না তা' ব'লে! অফিসের রাস্তায় জল জমে গেছে—অফিসে যখন শশিকান্ত পৌঁছুল তখন এগারোটা—তারই মধ্যে সাহেব পাঁচ বার চাপরাশী পাঠিয়েছে। সাহেবের কী! গাড়ীতে তো আসে! শেষকালে যা হবার তা' হোল—

অফিসে লোক এসেছিল কম—ছুটির পর যে যখন পেরেছে চলে গেছে। শশিকান্ত নিজের কাজে ডুবেছিল—যখন চোখ তুলে তাকালে—দেখলে লোকজন সব চলে গেছে! ফাইলও জমেছিল খুব, ভাবলে বৃষ্টিটা একটু কমলেই যাওয়া যাবে! কিন্তু রাত ন'টার সময় এমন বৃষ্টি এলো যা কলকাতা শহরে কুড়ি বছরে হয়নি!

তারপর সেই রাত্রে—মনে আছে—দরোয়ানের রুটি খেয়ে সারা রাত অফিসে কাটানো! রাত দুপুরে মনে হয়েছিল—যেন কারা দুম্ দুম্ করে চলে বেড়াচ্ছে! ফাইলের পর ফাইল। ফাইলের পাহাড়। কোন অদৃশ্য অশরীরীর পদক্ষেপে শশিকান্ত সারারাত আতঙ্কে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল।—সে-রাতের কথা এক দরোয়ান ছাড়া আর কেউ জানে না। এমন কাজের নেশা কোথা থেকে পেয়েছিল শশিকান্ত—কে জানে। কিন্তু উন্নতি ওই বড়বাবু পর্য্যন্ত! কাজই করেছে শশিকান্ত—কাজের লোক হোতে পারেনি।

সাতদিন আগে শশিকান্তর ফেয়ারওয়েল হ'য়ে গিয়েছে।

ছোট খাটো একটি সভা, দু'চারজনের বক্তৃতা—ফুলের মালা পরা—তারপর বড় সাহেবের সেই হাসিমুখে করমর্দ্দন।

সাহেব বললেন—তোমার শেষ জীবনে শান্তি কামনা করি শশি—এতদিন যেমনভাবে কাজ করেছ—অন্য কেরাণীদের কাছে তোমার চরিত্র একটা উদাহরণস্থল হয়ে থাকবে—শুনেছি শশি সারাজীবন তুমি অবিবাহিতই রয়েছ—রেল কোম্পানী তোমার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে—তার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ কোম্পানীর তরফ্ থেকে একটা ফ্রী কার্ড পাশ দেওয়া গেল—যতদিন জীবিত থাকবে ততদিনের জন্যে।

শশিকান্তর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল। বড় হঠাৎ! বড় হঠাৎ তার নিজেকে অসহায় দুর্ব্বল মনে হোল!

শশিকান্ত দূর অনেকদূর পর্য্যন্ত চেয়ে দেখলে। এই দোকান-পাট, এই ট্রাম-বাস রাস্তা পেরিয়ে আরো দূরে যেন সীমাহীন শূন্যতা! কোনও অবলম্বন নেই তার! কী নিয়ে তার দিন কাটবে! সেই শহরতলীর ছোট বাড়ীটাব কথা মনে পড়লো! সেই অল্পপরিসর বাড়ীতে আজ রাতটা না হয় কাটলো—না হয় কাটলো দু'টো মাস দু'টো বছর—তারপর? সকাল বেলা—যখন লোকেরা বাড়ী থেকে অফিসে ছুটবে—তখন শশিকান্ত ঘবেব ভেতরে কী নিয়ে থাকবে! এতদিন অনলস আগ্রহে যার সেবা করে এসেছে আজ সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল! শশিকান্তর মনে হোল—এ প্রত্যাখ্যান নয় তো কী! তার আর কোনও প্রয়োজন নেই! কোম্পানীর কাছে সে আজ অনাবশ্যক! শশিকান্তর নিজেকে বড় নির্বোধ মনে হলো। সমস্ত জীবন দিয়ে শুধু কোম্পানীকে সেবাই করেছে—প্রতিদানও চায়নি! যা প্রতিদান পেয়েছে তা সামান্যই! কিন্তু তবু তারই জন্যে একটি মুহূর্ত্ত সে বিলাসে বিশ্রামে উপভোগ করেনি! একটা পয়সা কোম্পানীর লোকসান হোলে নিজের লোকসান মনে করেছে! সে যেন এক নেশা; নেশার মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কেটে গেছে—

আর আজ তার মুক্তি—শশিকান্তর মনে হোল—এমন মুক্তি কি সে চেয়েছিল!

বড় হল্‌টার মধ্যে তার চেয়ার ঠিক সেই জায়গাতেই আছে—কালও থাকবে—কিন্তু কাল থেকে তাতে বসবে ভূপতিবাবু!

ভূপতি লোক ভাল। আজ বলছিল—আপনি আজকের দিনটাতে আর কাজ করবেন না বড়বাবু, একদিনের জন্যেও বিশ্রাম নিন্ একটু—

ভূপতি সত্যিই লোক ভাল। সেবার শশিকান্তের অসুখের সময় নিজেই কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে খাইয়েছিল। কোনও দিন সেবা, স্নেহ, ভালবাসার প্রয়োজন হয়নি শশিকান্তের—পায়ও নি। সে সময়, সে অবসর শশিকান্তর ছিল না। কোম্পানী তার পাওনাগণ্ডা সুদে-আসলে আদায় করে নিয়েছে! করে একদিন আত্মীয়ের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে বাড়ী থেকে শশিকান্ত পালিয়েছিল—সে কথা আজ মনে নেই—তারপর নাগপুর, রায়পুর, বিলাসপুর সব শেষ করে হেড্ অফিসে কলকাতায় এসে হাজির। যে ঘরকে অবজ্ঞা করেছিল—ঘর বাঁধা আর তার হোল না। কোম্পানী যখন তাকে বিদায় অভিনন্দন জানালে—তখনই শশিকান্তের মনে হোল—যেন বড় দেরী হয়ে গেছে। তাই শশিকান্ত সেই অল্পপরিসর ঘরখানার কথা মনে করতেই সংসারের অভাব বড় বেশী করে অনুভব করলে।

চাপরাশীটার হাতে শশিকান্ত আসার সময় একটা টাকা দিয়ে এসেছে। চাপরাশীটা খুশি হয়েছে! দুঃখও হয়ত একটু হয়েছে! হওয়াই স্বাভাবিক। নিয়ম করে মাদ্রাজী টিফিন্‌রুম থেকে চা এনে দিত! বলতে গেলে তাই! বিয়াল্লিশ বছর এমনি কেটে গেল। প্রতিটি দিন প্রখর নিয়মানুবর্ত্তিতায়

বাঁধা—প্রতিটি মুহূর্ত। প্রতি পদক্ষেপে শশিকান্ত এক-এক ধাপ এগিয়েছে —বিয়াল্লিশ বছর ধরে এগিয়েছে—শুধু শেষ হবার জন্যেই।

রাত্রে কতদিন একক শয্যায় শশিকান্ত 'দ্বিজপদ দ্বিজপদ' বলে চেঁচিয়ে উঠেছে—দ্বিজপদ তার চাপরাশীর নাম। দ্বিজপদ না হলে সাহেবকে ফাইল দিয়ে আসবে কে? স্বপ্নে শশিকান্ত সাহেবকে ফাইল পাঠাতো। শশিকান্তের মনে হোল—নিজের সন্তানের কথাও কেউ এত ভাবে না— সন্তানের কথায়ও কেউ এত উদ্বিগ্ন হয় না।

তখন সবে চোদ্দ বছরের ছেলে! সেই বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল সুদূর নাগপুরে! কাকার সঙ্গে ঝগড়া করে। আর—আর একজনের কথা তার মনে পড়লো—

সেই ট্রামবাস মুখরিত নগরীর জনারণ্যে—আগতপ্রায় সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে—কী জানি কেন—দূর থেকে—অনেক দূরের বিস্মৃতপ্রায় একটি মুখ—কচি অত্যন্ত কচি মুখ—কান্নায় ছল ছল—শশিকান্ত হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—

কাকা বলেছিল—বিয়ে? বিয়ে করবি—তো খাওয়াবি কী?— ডেঁপো কোথাকার—এই বয়েসেই জাহান্নমে গিয়েছ—বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে—

শশিকান্ত জাহান্নমে গেছে—সত্যিই সে জাহান্নমে গেছে। একটি মাত্র অবলম্বন ছিল—তাও গেল।

শশিকান্তের মনে হোল—এ পথ যেন আর ফুরোবে না। যেন বাড়ীর পথে না গিয়ে বৃত্তাকার একই পথে ঘুরছে। তার কোনও কাজ নেই আর। আর সকলেরই কাজ আছে, আছে প্রয়োজন, নেই শুধু তার। না, কালই সে চলে যাবে। পাশ তো আছেই। ট্রেনে উঠে বসবে।

দু'চোখ যতদূর যায়—ততদূর! কোম্পানী তাকে কৃপা করেছে—সে কৃপার মর্য্যাদা সে রাখবে। ট্রেনের সেই যাত্রা, দিন রাত্রি ধরে অবিরাম যাত্রা! কতদিন সে ট্রেনে চড়েনি! রেলের চাকরী তার—আশ্চর্য্য, সে-ই রেলে চড়েনি।

হঠাৎ শশিকান্তর জ্ঞান হোল—তাইতো! তার ড্রয়ারের চাবি সে তো সঙ্গে করেই এনেছে! কাল থেকে এ চাবি তো ভূপতির কাছে থাকবে। কাল এই চাবির অভাবে ভূপতির কাজ আটকে থাকবে যে!

শশিকান্ত ফিরিল।

আবার সেই পথ! বিয়াল্লিশ বৎসরের পরিচিত—পথ—! কাল থেকে তার সঙ্গে অফিসের সমস্ত সম্পর্ক শেষ! বিচ্ছেদ! আজই চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে! দারোয়ানের হাতে সে দিয়ে আসবে—ভূপতিবাবু এলেই যেন পরদিন তাকে দিয়ে দেয়। বিয়াল্লিশ বছর কাজ করার পর—শেষ দিনে তার একি ভুল!

সমস্ত অফিসটা অন্ধকার—কোন্ কোণে হয়ত একটা দু'টো আলো জ্বলছে। শশিকান্ত নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলো। দারোয়ানটা কোথায় কে জানে—হয়ত কাছেই কোথাও আছে।

নিজের পরিচিত পরিবেষ্টনীতে এসে শশিকান্ত যেন তৃপ্তি অনুভব করলে। নিজের রাজত্ব তার। এখানে বিয়াল্লিশ বছর কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করেনি!

শশিকান্ত নিজের চেয়ারটিতে এসে সেই ছোট টেবল্ ল্যাম্পটি জ্বাললে। তারপর চাবি দিয়ে তার আলমারী আর ড্রয়ার খুললো। কাল তাকে এ সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। কাল এই আলমারী এসে খুলবে অন্য একজন। শশিকান্তের মনে হোল—এ অন্যায়—এ অনধিকার প্রবেশ!

চারিদিকে ফাইলের স্তূপ—বড় চমৎকার দেখতে। এত আনন্দ শশিকান্ত কোথাও গিয়ে পায় না। সেইখানে বসে শশিকান্ত একে একে ড্রয়ার খুলে যতসব কাগজপত্র বার করতে লাগলো। কতদিনকার কত স্মৃতি-বিজড়িত—কত বিগতস্মৃতির বাহন—শশিকান্তর হঠাৎ বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হোল। মনে হোল—প্রকাণ্ড ভুল হয়ে গেছে। যদি সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারতো।

একটা ভাঙা খাবারের কৌটো, একটা টিন্চার আইওডিনের শিশি। খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া—কত জিনিষই দিনে দিনে স্তূপীকৃত হয়েছে।—

রাত এখন ক'টা? এমন সময়ে অন্যদিন শশিকান্ত নিজের মনেই কাজ করে চলেছে!

ড্রয়ারের নীচে এককোণে একটা চিঠি—শশিকান্তরই চিঠি! শশিকান্ত চিঠিখানা আলোয় তুলে ধরলে। না—তারই তো চিঠি! কোনও সন্দেহ নেই! পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার হাতে এসেছে! এতদিন এ চিঠি খোলাই হয়নি। আশ্চর্য্য! অফিসের কাজে হয়ত ব্যস্ত ছিল —পরে পড়বে ভেবে ভেতরে রেখেছিল—তারপর সেই রাখাই আছে। আশ্চর্য্য!

শশিকান্ত ক্ষিপ্রহস্তে খামখানা ছিঁড়ে ফেললে। চিঠিখানা অনেক যায়গা ঘুরে তবে এসে পৌচেছিল তার হাতে—অনেক পোষ্ট অফিসের দাগ!

চিঠির পাতায় চোখ বুলিয়ে শশিকান্ত যেন হতবাক্ হয়ে গেছে! স্পন্দহীন দেহ যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে!

চিঠি লিখেছে তিলোত্তমার বাবা!

শশিকান্ত এক নিঃশ্বাসে পড়তে লাগলো—

"বাবা শশিকান্ত—

তোমার কাকা গত সংক্রান্তির দিন দেহত্যাগ করেছেন। এখন তোমাদের পক্ষ থেকে তোমার সঙ্গে তিলোত্তমার বিবাহে কারো আপত্তি উঠবেনা—আমার কোনও আপত্তি নেই—বরং সুখী হব—তুমি ছুটি নিয়ে এস—এই মাসের মধ্যেই বিবাহ যাতে হয় সেই ব্যবস্থাই করছি—ইতি।"

শশিকান্ত চিঠির তারিখ দেখলে, পুরোপুরি পঁয়ত্রিশ বছর আগের চিঠি!

শশিকান্ত সেই চেয়ারের ওপর বসে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো চিঠিখানা। হঠাৎ তার চীৎকার করতে ইচ্ছে হোল। যেন সে পাগল হোয়ে যাবে। সে প্রবঞ্চিত হয়েছে! প্রবঞ্চিত হয়েছে সে! সবাই যেন ষড়যন্ত্র করেছে তার সঙ্গে। পৃথিবীর আর পাঁচজন যে সুখভোগ করছে—তা থেকেও সে বঞ্চিত। এ ষড়যন্ত্র নয় তো কী! বিয়াল্লিশ বছর ধরে ষড়যন্ত্র চলছিল—আজ ধরা পড়ল যেন। আজ—যখন তার কোনও অবলম্বন নেই—নেই আশ্রয়—নেই স্নেহনীড়—নেই অভিযোগ করবার মানুষ।

তারপর সেই অফিসের নির্জ্জন ঘরের অভ্যন্তরে অনন্ত সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো—দূর দূরান্তের শকুন এসে আকাশ কলঙ্কিত করে—আর বন্দর থেকে বাতাসে ভেসে আসা জাহাজের বাঁশীর শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়! এ পৃথিবী ছাড়িয়ে স্বপ্নলোকের অলিন্দে দাঁড়িয়ে কে যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকতে থাকে! শশিকান্তের মনে হোল—গেল। সব গেল! জীবন তো এমন ছিল না! এ কোন্ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অকল্পিত পরিবেষ্টনী! পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দিক্‌চক্রবালের অন্তরাল ছড়িয়ে কে যেন কোন আশ্চর্য্য প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিল—আর তার আলো নেই, উত্তাপ নেই, শুধু ধুমান্বিত কলঙ্ক! আকাশ বাতাস সব বুঝি কলঙ্কিত হয়ে যায়।

আর সেই মুহূর্তে রাত্রির অন্তর মথিত করে এক অপরূপ শব্দ উঠলো। সেই ক্ষীণ শব্দ ক্রমে ভয়ঙ্কর হোল—তারপর সেই শব্দের কল্লোলে জন্ম নিল অসংখ্য তরঙ্গ। মৃত্যুর আর জীবনের, আশার আর হতাশার, মিলনের আর বিচ্ছেদের অসংখ্য তরঙ্গ। সেই তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে জীবন-মৃত্যু সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর শশিকান্তের মনে হোতে লাগলো—গেল, সব গেল—

*   *   *   *

পরদিন প্রথমে দেখলে ঝাড়ুদার—ঘর ঝাঁট দিতে এসে।

তারপর একে একে সবাই এল—কেরাণীরা, ভূপতিবাবু, দ্বিজপদ সবাই—

শশিকান্তের উপস্থিতিতে সবাই যেন নির্ব্বাক হয়ে গেছে। সবাই দেখলে শশিকান্ত চেয়ারের ওপর বসে—শশিকান্তর টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ আর শশিকান্ত নিরুদ্বেগ, নিশ্চঞ্চল—এক মনে কাজ ক'রে চলেছে; সেই নিস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে সহসা কেউ কথা বলতে সাহস করলে না—সকলেরই মনে হোল শশিকান্ত আজ অপ্রকৃতিস্থ—নিশ্চয় সে উন্মাদ হয়ে গেছে।

দেবরাণীর সাধ

এখন এগারোটা বাজলো। দেবরাণীর সমস্ত রান্না হয়ে গেছে ; সেই কোন্ সকালে উঠে রান্না ঘরে ঢুকতে হোয়েছে ; কী-ই বা রান্না ? খেতে তো মাত্র তিনটি লোক ; তবু এটা ওটা কোরতে কোরতে দেবরাণীর অনেক বেলা হোয়ে যায়। এখন এগারোটা বাজলো—এখনই ভাতটা চাপিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু দেবরাণীর মনে হয়—ওটা কোরলে হোত—ওবেলার জন্যে ডিমগুলো সেদ্ধ কোরে রাখলে ভাল হোত—ময়দা মেখে বিকেল বেলার জন্যে খাবার কোরে রাখলে হোত—কিম্বা উনি টোম্যাটোর চাট্নি ভালবাসেন—সেটাও কোর্লে হোত—অথবা আলোপাড়ার ভূষণ একটু আগেই একগাদা গল্দা চিংড়ী দিয়ে গেছে—সেগুলো না ভাজলে হয়ত খারাপ হয়ে যাবে—

এ-ছাড়া দেবরাণীর আর কী চিন্তা থাকতে পারে ? সেই ভোর বেলা উঠে স্বামীর জলখাবার কোরে দিয়ে তাড়াতাড়ি কুয়োতলায় চান কোরে নিয়েছে—চান কোরতে এখন আর দেবরাণীর সেই আগের মত দেরী হয় না ; কোলকাতায় থাকতে বোর্ডিং-এর সেই বাথরুমের কথা এখনও দেবরাণীর মনে আছে,—টাবের ভেতর সমস্ত দেহ শিথিল করে এলিয়ে দিয়ে আরাম করে শুয়ে থাকা—সেই জল-বিলাস—বাইরে থেকে মেয়েদের দলের সে কী দরজা ঠেলা— ! সমস্ত দেহের অবগাহন না হোলে স্নান কোরে আরাম কোথায় ? আর যা-ই হোক্—ঘুম না হোলেও চলতো—খাওয়া সেও দ্বিতীয়ত—সবার আগে স্নান ; তখন দেবরাণীর মনে হোত : আগের জন্মে সে নিশ্চয়ই কোন জলজন্তু ছিল—মেয়েরাও তাই

বোলতো! কিন্তু এখন? এখন কুয়োতলার চারপাশে ভাল কোরে ঘেরাও নেই—চাটাই-এর বেড়া পচে পচে খসে গেছে—তার মধ্যে সত্যি সত্যি দেবরাণীর আবরু রক্ষা হয় না, হবার কথাও নয়! বেশ নিশ্চিন্তে নির্ব্বিঘ্নে সেখানে স্নান করা অসম্ভব—সমস্ত দেহ মার্জ্জনা কোরতে হোলে লজ্জাহীনা হোতে হয়—তা' দেবরাণী পারে না! খানকয়েক পাতা ইটের ওপর সাবধানে পা রেখে অতি সত্বর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত দেহের সমস্ত স্থান কোনও রকমে ভিজিয়ে নিয়ে নামমাত্র স্নান সেরে নিতে হয়! ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেবরাণী মোটা চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ায়; লম্বা কালো কুচ্‌কুচে চুল—চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে দেবরাণী নিজের মুখখানাকে ভাল কোরে দেখতে থাকে। ফরসা একখানি মুখ—আগে গালের দিকে লাল আভা ছিল—এখন দেবরাণার মনে হয় যেন হোলদে রং ধরতে সুরু হোয়েছে,—সেই মুখের ওপরে ঠিক সিঁথির গোড়ায় সিঁদুরের দাগ লাগিয়ে কপালে একটি ছোট ফোঁটা দিয়ে দেবরাণীর মনে পড়ে এতক্ষণে উনুন ধরে যাবার কথা। দিনের মধ্যে কত কাজ দেবরাণীর! উঃ কত তার কাজ! এই সামনে বর্ষা আসছে, চোত মাসের রদ্দুরে আচারের শিশি, বড়ির হাঁড়িগুলো শুকুতে দিতে হয়—ওপরের ঘরে কলাই আর মুগ রয়েছে—সেগুলো ছাদের ওপর পা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হয়—দুপুর বেলা ভিজে চুল মেঝের ওপর এলিয়ে দিয়ে, গায়ের কাপড় শিথিল কোরে দিয়ে, হাতে একটা কিছু বই কি মাসিক পত্র দেখা—এখানে আসা অবধি এটা একটা দেবরাণীর অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে! কিন্তু তবু শান্তি নেই—সারা বাড়ীর কাজকর্ম্ম গতর দিয়ে খেটে দুপুর বেলা দেবরাণী যে একটু ঘুমুবে—কি কাউকে একটা চিঠি লিখবে তা'ত হবার যো নেই! সবে মাত্র দেবরাণী

হয়ত গা-টা একটু এলিয়ে দিয়েছে, এই বোশেখের আম-পাকা তুপুরে দেহ-মন, বেশ-বাস অবিন্যস্ত কোরে দিয়ে একটা হাত-পাখা নিয়ে দেবরাণী চিৎ হয়ে শুয়েছে—ঠিক সেই সময় হয়ত দেখা যাবে কা'দের একটা গরু কোথা দিয়ে উঠোনে ঢুকে শাক-সবজির ছোট বাগানটুকু নিঃশেষ করতে উন্মুখ—ধানিলঙ্কার চারা গরুর পায়ের চাপে মরো মরো; কানাইবাঁশী কলাগাছের সরু একটু কচিপাতা একেবারে মুড়িয়ে খেয়েছে, কিম্বা দেবরাণীর নিজের হাতে পোঁতা গাঁদার চারা গুলোর কোনও চিহ্নই নেই। এসব দেখলে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক—তুটো তুটো চাকর ঝি, সবাই নিজের নিজের কাজ সামলাচ্ছে; অগত্যা দেবরাণীকেই উঠতে হয়; ওই রোদ্দুরে —ভাবো একবার—উঠোনে এসে গরু-তাড়ানো! তাড়িয়ে দিয়ে খিড়কির ঝাঁপটা বন্ধ করতে হয়! খাওয়া দাওয়ার পর এই ওঠা-নামা সত্যিই অসহ্য! বিশেষ করে দেবরাণী আজকাল একটু মোটা হয়েছে—বেশ মোটা হয়েছে; অবশ্য গিন্নীবান্নী মানুষের মোটা না হোলে মানায়ও না; সেই স্থূল বক্ষদেশের নীচে স্থূলতর মেদপিণ্ডের মাংসল শুভ্রতা—আর কিছু দিন পরেই তা' দৃষ্টিকটু ঠেকবে! সত্যি সত্যি আগে দেবরাণীর ফিগার কেমন সুসমঞ্জস ছিল। সেদিন সেই হাল্কা শরীর নিয়ে দেবরাণী তেতলা বোর্ডিং বাড়াটা কতবার ওঠা-নাবা কোরেছে—টাবের ভেতর জলমগ্ন অবস্থায় কী লোভনীয় ছিল তার কাছে তার এই নিজের দেহ! ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেবরাণী কতবার নিজেই নিজের প্রেমে পড়েছে! শরীরের ওপর সেদিন কী তার অনুরাগ—বিছানার পাশে ছোট টিপয়টা কত রকমের টয়লেট্ শিশিতে ভরে গিয়েছে, একটু সর্দি হয়েছে, কি কোমরে একটু ব্যাথা হয়েছে, তখুনি ডাক্তার চাই! আর এখন? প্রায় দিন ও সেমিজ ব্লাউজ না পরেই কাটায়—যে গরম, আর কেই বা তা'কে

দেখছে! এখানে ট্রাম বাসও নেই—সিনেমা-টকিও নেই—আর রাস্তায় বাসে চলতে চলতে সুসজ্জিত যুবকদের ভিড়ও নেই

কিন্তু আর যাই হোক, এত নির্জ্জনতা, এত নিঃসঙ্গতা দেবরাণীর অসহ্য মনে হয়। স্বামী মানুষটি নিজের ডাক্তারী নিয়েই আছেন, আশেপাশের দশ বারোখানা গ্রাম তারই ওষুধের ওপর নির্ভব কোরে বেঁচে আছে! লোকটি যে কেমন ধাবা দেবরাণী আজ পর্য্যন্ত তার ঠিকানা পায়নি—দেবরাণীর দিকে, দেবরাণীর দেহের দিকে চোখ রেখে কোনও দিন তিনি কথা বলেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর সময় কোথায়? ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত একেব পর এক মহামারী এসে চলে যায়, স্বামীর দিন রাত্রি কাটে বাইবে বাইরে; ঘরের প্রাণীটি মরলো কি বাঁচলো সে খবব রাখাব কথা তাঁর আদৌ মনে থাকে না!

দুপুর—চন্‌চনে রদ্দুর। মাঠ ঘাট ভেঙে ঘোড়ায় চড়ে শ্রীপতি এল; দেবরাণী দূর থেকে দেখতে পেযেই সরবৎ পাখা জল সমস্ত কিছু সবঞ্জাম নিযে তৈরী হোযে আছে—আসবামাত্রই যেন কর্ত্তব্য সম্পাদনে এতটুকু দেরী না হয়। কিন্তু কতক্ষণ কেটে গেল, দেবরাণী চুপ কোরে মুহূর্ত্ত গুণছে—সরবৎ গবম হোযে এল,—শ্রীপতির আর দেখা নেই। শেষকালে ঝিকে ডিস্‌পেনসারীতে খবর আনতে পাঠান হোল; ঝি এসে খবর দিলে—বাবু আবার বেরিয়েছেন আসতে তাঁর দেরী হবে বলে গেছেন। আর বলে গেছেন দেবরাণী যেন তার জন্যে বসে না থাকে—খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে, একটি কলেরা রুগী মরো মরো!

সেই অবস্থায় দেবরাণীর মনের অবস্থা কেমন হয়! অবশ্য প্রথম প্রথম দেবরাণী স্বামীর জন্যে এই রকম সমস্ত দিনই হয়ত উপোষ কোরে বসে থাকতো, কিন্তু সে অনুরাগ কতদিন থাকে? বাসি পেটে পিত্তি

পড়লে দেবরাণী আজকাল অসুস্থ হয়—অম্বল উঠে গলা জ্বালা করে, ভাল হজম হয় না—মাথা টিপ্ টিপ্ করে, আরো কত কি…দেবরাণীর শরীর খারাপ হোলে এ সংসার চলবে কেন ?…একদিন যদি সে বিছানায় পড়ে থাকে—এত বড় সংসার সমস্ত নয়-ছয় হয়ে যাবে, স্বামী খেতে বসবার সময় কে পাখার বাতাস করবে, ঘরে আসবা মাত্র তক্ষুণি কে হাতে সরবৎ তুলে দেবে ?—যে ভুলো মানুষ এতগুলো লোকের দায়িত্ব শ্রীপতির হাতে, ডাক্তার নিজে সুস্থ থাকলে তবে তো লোকের চিকিৎসা কোরবে। সুতরাং এত কাজ এত ব্যস্ততা না কোরলে সংসাব কি চলে ? সংসার তো আর ছেলেখেলা নয়! দেবরাণীর তাই স্বস্তি নেই—মনে শান্তি নেই। সংসার-চক্রের ঘর্ঘর শব্দে দেবরাণী ক্লান্ত।

তা' হোক, এই এখন এগারোটা বাজলো। এরি মধ্যে চারিদিকে রদ্দুরে ঝাঁ ঝাঁ করছে। রান্না তার সমস্ত হোয়ে এসেছে—শুধু ভাতটা চাপিয়ে দিলেই হোল। রান্নাঘরের চারিদিকে ঝুল জমেছে—কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে—অস্পষ্ট মৃদুমন্থর শব্দে ঘরের আবহাওয়া মুখর হয়ে উঠল; পিঁড়ির ওপর বসে হাঁটুর ওপর হাতের কনুই রেখে দেবরাণীর সমস্ত অন্তর বাণীময় হোয়ে উঠছে, কালো লম্বা মতন—আলুথালু চুল-ভরা মাথা—ঋজু দেহ বেঁকিয়ে টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন পড়ছে,—বইয়ের পাহাড় চারপাশে—খাতার কাগজে তার হাতের অক্ষর গুলো বেঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে—পাতায় ছাপা অক্ষর গুলো ছবির মত স্পষ্ট হোয়ে উঠছে—কোনও দিকে তার মন নেই—তাকে ঘিরে, তাকে কেন্দ্র কোরে দেবরাণীর হঠাৎ সমস্ত অভিমান অভিযোগ ঘনীভূত হোয়ে উঠল। কেন সে আসে না। সে একবার আসে না কেন ? তবে কেন সে ভালবেসেছিল ? কী এমন তার কাজ—একবার কেন সে

আসে না! দেবরাণী কী এমন দোষ করেছে! সে-ও তাকে ভুলতে বসেছে! দেবরাণীর কেউ নেই! কেউ নেই দেবরাণীর! কেন এমন হয়! সেই রান্নাঘরের ভেতর—কি যে হোল—দেবরাণী কেঁদে ফেললে! যার জন্যে কাঁদা সে হয়ত জানতেও পারছে না! কেন তবে বেঁচে থাকা দেবরাণীর কেউ নেই! কেউ নেই দেবরাণীর! দেবরাণী আবার কাঁদতে লাগলো! সে যদি ভুলতে পেরেছে—দেবরাণী কেন ভুলতে পারবে না! ওরা সব পারে! সব পারে ওরা! হাঁড়ির দিকে চোখ মেলে দেবরাণী বসে রইল—ভাত ফুটছে!

বিকেলবেলা—চারিদিকে বেশ স্পষ্ট অন্ধকার। সৌরভীকে সঙ্গে নিয়ে দেববাণী পুকুর ঘাটে এল! এই পুকুরঘাটটি হচ্ছে দেবরাণীর গড়ের মাঠ। দূরে মাঠের পর মাঠ—যতদূর চাও ধু ধু করছে মাঠ আর পশ্চিমদিকে ঘন আম কাঁঠালের বাগান। বাগান বা বন দুই-ই বলা চলে। সাবান আর গামছা নিয়ে সৌরভী ঘাটের শেষ সিঁড়িতে এসে বস্‌লো! এই দু'জন ছাড়া ঘাটে আর কেউ নেই—দেববাণীর দুই চোখে যেন সেই পুরোন দিনের নেশা ফিরে এল; সেই মাঠে মাঠে বেড়ান—সেই বাসে চড়ে মেয়ের দল বেঁধে লেকে যাওয়া—সেই বায়স্কোপ, পিক্‌নিক্‌, সরস্বতী পুজো, শিবরাত্রির রাতে হল্লা করে কাউকে ঘুমুতে না দেওয়া, আর গরমের দুপুরবেলা ব্রীজ খেলা! দেবরাণীর চোখে আনন্দ উপচে পড়ছে—সমস্ত দেহ চঞ্চল হয়েছে—দেবরাণী গুনগুন করে গান গাইছে!

জলের ভেতর দু'টো পা ডুবিয়ে দিয়ে দেবরাণী পিঠের কাপড়টা খুলে দিলে—সৌরভী সাবান ঘষতে লাগল। দেবরাণীর দেহ বেয়ে সাবানের ফেনা জলে গড়িয়ে পড়ছে—পড়ে ভাসছে। পা দিয়ে সেই জল ছিটোতে ছিটোতে দেবরাণী চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘাটে আজ কেউ নেই; এই ঝাপসা

অন্ধকারে দেবরাণীর হঠাৎ সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হোল। এক ডুবে ওই—ওই পর্য্যন্ত—ওই ওপারে দেবরাণী যেতে পারে। অনেকদিন অভ্যেস নেই—দেবরাণী কি পারবে? ঘাটে কেউ নেই—এপার থেকে ওপার সব দিক ভালো করে দেখে নিলে—কেউ কোনও আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তা'কে দেখছে না তো! অবশ্য তার শরীরে সে যৌবন আর নেই—দেবরাণী এখন মোটা হতে আরম্ভ করেছে। আর বয়সও বাড়ছে! বাড়ছে বৈকি! আর কতদিনই বা! দেবরাণী মরিয়া হোয়ে উঠল। হঠাৎ দেবরাণী ভালো করে কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে বেঁধে নিলে—সাঁতার কাটতে কাটতে ডুব জলে কাপড় খুলে গেলে লজ্জায় পড়তে হবে! এখন, এই মুহূর্ত্তে দেবরাণীর ষোল বছর বয়েস আবার ফিরে এসেছে।

সৌরভীকে বললে—দেখিস তো সৌরভী, কেউ আসে কি না, এলে বলিস—আমি সাঁতার কাটবো—

সৌরভী ভয় পেয়েছে; বললে—সে কি মা, সন্ধ্যেবেলা, কাজ নেই, বাবু শুনলে রাগ করবে—যদি কেউ কিছু মন্দ বলে—?

কোমরে কাপড় আঁটতে আঁটতে দেবরাণী বল্লে—আমি কার ভয় করি বল্ তো—আর ক'দিনই বা, আর দিন কতক বাদেই তো বুড়ী হয়ে যাব, তখন কি আর সাঁতার কাটতে পাবো—তুই বসে থাক—দেবরাণী ঝাঁপ দিয়ে জলে লাফিয়ে পড়লো—

কেবল অন্ধকার—দেবরাণী ভাসতে ভাসতে পুকুরের মাঝখানে এসে পড়েছে। এই জল পালকের মতো নরম আর ঠাণ্ডা! দেবরাণীর প্রত্যেক অঙ্গ এই জলের স্পর্শে উন্মাদ হয়ে উঠল। অনেকদিন অভ্যেস নেই—এখন শরীর আর তেমন হাল্কা নেই—দেবরাণী জলের ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে ভেসে রইল। আজ যদি তা'কে কেউ এই অবস্থায়

দেখে ফেলে। এই অর্দ্ধ অনাবৃত অবস্থায়!···আজ দেবরাণীর লজ্জা নেই—ক'দিনই বা! নিজের লজ্জা আর আবরু বাঁচিয়ে দেবরাণী অনেক-দিন কাটিয়েছে, তবু কিছুই তার লাভ হয়নি! সে একদিন ছিল যখন দেবরাণী এই লজ্জায় এই আত্মপ্রবঞ্চনায় নিজেকে ঠকিয়েছে, ঠকিয়েছে পরকে! নইলে, আজ দেবরাণী হয়তো এই পাড়াগাঁয়ের এক ডাক্তারের স্ত্রী না হোয়ে, হোত কোলকাতার একটি বাড়ীর বধু! ছেলেটি ঘরে বসে পড়তো, এগ্‌জামিনের পড়া, টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে বসে পড়তো, সামনে টেব্‌লে ল্যাম্পের নীচে আলোর পোকারা খেলা জুড়ে দিয়েছে; দেবরাণী পালিয়ে এসে, ছেলেটির পেছন দিকে টিপি-টিপি পায় এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতো, তারপর তার উপস্থিতি জানাবার জন্যে একটু শব্দ কোরে নিঃশ্বাস ফেলতো—ছেলেটি উঠতো চম্‌কে—পড়া না ছাই—উঃ যেন কত পড়ায় মনোযোগ! ছেলেটি চেয়ারে পেছন দিকে হেলান দিয়ে টপ্‌ কোরে দুই হাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরতো; দুষ্টুর শিরোমণি, সেই হাতের চাপে তার খোঁপা পড়তো খুলে—সেই চুলে ছেলেটিব মুখ অন্ধকার হোয়ে ঢেকে যেতো; আর দেবরাণী? হি হি কোরে হেসে উঠতো দেবরাণী—কত মজা তখন! দেবরাগী মুখখানা কিছুতেই নাবাবেনা—ছেলেটিও ছাড়বে না—শেষ পর্য্যন্ত—? শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটিকে কি দেবরাণী ঠেকাতে পারতো! দেবরাণীর গায়ে কি অত জোর আছে! যা আবদারে ছেলে সে, তার মুখের ওপর দেবরাণীর মুখখানা অন্ততঃ একবারও নামাতে হোত—তারপর?—তারপর সামনেই এগ্‌জামিন—ক'টা দিন ধৈর্য্য ধরে থাকতে বলে দেবরাণী চলে আসতো; কিন্তু দেখ, দেবরাণীরও হয়তো ধৈর্য্য থাকতো না—ঘণ্টাখানেক পরেই কাজ করতে করতে দেবরাণী আবার হয়তো কোন ফাঁকে ছেলেটির চেয়ারের পেছনে

গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছে—দিনের পর দিন—এমনি কতবার—! জলের ওপর ভাসতে ভাসতে দেবরাণী এই সব কথা ভাবছে!

তারপর—তারপর এগ্‌জামিন হোয়ে গেল, সেই দুর্ভাবনার দিনগুলো যুগগুলো সত্যি সত্যি চলে গেল? বাইরে থেকে বন্ধুরা আসতো বিকেল বেলা ডাকতে কি ময়দানে খেলা দেখতে যেতে, কি দুপুর বেলা ব্রিজ খেলতে—ছেলেটি ছোট ভাইকে দিয়ে বলে পাঠাতো—'বলগে যা বাড়ী নেই।' দার্জ্জিলিং থেকে এক বন্ধু সেখানে যাবার জন্যে অনুরোধ করে চিঠি লিখতো—ছেলেটি বলে পাঠাতো—'শরীর খারাপ!' ছেলেটি কি কম দুষ্টু! বাড়ীর কোনও কাজ নেই—বন্ধু-বান্ধব নেই—নেই পড়াশুনা, নেই খেলা—কাজের মধ্যে কাজ দেবরাণীর পেছনে লাগা! ভাঁড়ার ঘরের এক কোণে বসে দেবরাণী আপন মনে পান সাজছে—কোনও কাজ নেই হঠাৎ ঘোমটা-টোমটা খুলে দিয়ে—পান সুপুরি চুন একাকার কোরে দিয়ে ঝড়ের মতো চলে গেল। বিকেল বেলা যেই গা ধুয়ে এসে সবে মাত্র ঘরে ঢুকেছে—ঘরের দরজা জানালা বন্ধ কোরে কাপড় ছাড়ছে নিঃসঙ্কোচে, কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে চুপি চুপি তা'র চোখ টিপে ধরেছে—চোরের মত তার চোখ দু'টো জোরে টিপে ধরেছে! সে ছাড়া এমন দুষ্টুমি আর কার? বল তো কী লজ্জা!

কাঁটাল আর আম বাগানের ভেতর অজস্র অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে দু'একটা। কাছাকাছি কাদের কথাবার্ত্তার টুক্‌রো—টানা টানা গানের সুর বাতাসে দূর থেকে ভেসে আসছে—

দেবরাণীর মনে হোল: যদি এখন, এই এখনি সে ডুবে যায়। যদি তলিয়ে যায় তলায়! হোতেও তো পারে এমন। ধর, কাপড়ে তার পা

দু'টো জড়িয়ে গেল। যত সে ছাড়াতে চেষ্টা করছে ততো যাচ্ছে জট পাকিয়ে—শেষে আর তার দম নেই! নিঃশ্বাস নিচ্ছে জোবে জোরে মুখ দিয়ে আর নাক দিয়ে। কোনও রকমে সে ডাকতে পারলে, 'সৌরভী, সৌরভী'! ঘাটে বসে সৌরভী ঝিমোচ্ছে (আর যে ঘুম ওর, সন্ধ্যে না হোতে হোতেই ওর ঢুলুনি ধরে) হয়ত শুনতেই পাবে না তার চীৎকার, আব যদিই বা শুনতে পায়, তা'হলে হয়ত এই বিপদের আকস্মিকতায় কী কোরবে সে তাই হয়ত ভেবে উঠতে পারবে না; তারপর লোকে যতক্ষণে খবব পাবে, ততক্ষণে দেবরাণী হয়ত একেবারে জলের তলায় কাদায় আর পাঁকে মুখ ঘষছে—শেষ নিঃশ্বাসটুকুও তার তখনি বেরিয়ে গেল। সে খবব, তার মৃত্যুব খবর শ্রীপতি শুনবে! শুনবে, চুপ কোরে থাকবে, তারপর একটু কাঁদবে কি আর না?...কাঁদবে বৈকি—মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাঁদবে, হয়ত সেদিন কিছুই খাবে না—রাতে ঘুম আসতে দেরী হবে একটু, তারপর সকালে উঠে আবার যে কে সেই! অবশ্য চিরকাল কে কাকে মনে রাখে। না, মনে রাখা যায়। তার শোকে শুধু কাঁদলেই তো আর শ্রীপতির চলবে না। তার ডাক্তারী আছে, ডিস্‌পেনসারী আছে, নিজের শরার আছে—ক্রমে ক্রমে তাকে ভুলে যাবে বৈকি! কিন্তু হঠাৎ—জোনাকি পোকা আর অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেবরাণীর মিনতি-ভরা চোখে একটি কামনা জেগে উঠলো : আর—আর একজন যেন তাকে মনে রাখে! সে যেন তাকে না ভোলে। তার সেই ছেলেটির মনে দেবরাণী অক্ষয় হয়ে থাকে; একদিন দেবরাণী তাকে কত ভাল বেসেছিল, কত রাত তার জন্যে দেবরাণীর চোখে ঘুম আসেনি, কত দিন বসে বসে তার জন্যে একলা আপন মনে নিঃশব্দে কেঁদে ভাসিয়েছে সে কথা সে যেন না ভোলে। সে যেন মনে রাখে,

তাকে এখানে আসবার জন্যে কতবার সে চিঠি লিখেছে, তাকে হারিয়ে দেবরাণীর জীবন কত ব্যর্থ হোয়ে গেছে। যখন সে পড়াশোনা শেষ করে বিছানায় গিয়ে শোবে, শুয়ে আলো নিবিয়ে দেবে, তখন এক ফাঁকে দেবরাণীর কথা যেন তার ভাবতে ইচ্ছে হয়। যেন দেবরাণীকে স্বপ্নে দেখে মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যায়, আর শীতের রাতে আর বর্ষার রাতে বিছানা যখন তার ঠাণ্ডা হিম হয়ে আছে, তখন দেবরাণীকে মনে কোরে সে যেন একটা কবিতা লেখে। আর যেন—

দূর থেকে সৌরভী ডাকলে—মা—

তীব্র নিখাদে সুর উঠেই হঠাৎ স্বরোদের তার ছিঁড়ে গেল। দেবরাণী প্রথম আবিষ্কার কোরলে রাত হয়েছে। তারপর বুঝলে অনেকক্ষণ হোল সন্ধ্যে উৎরে গেছে। দেবরাণীর মনে হোল : সত্যি সত্যি এত রাত করা তার উচিত হয়নি। কত কাজ তার পড়ে আছে সংসারের! উঃ কত কাজ!

দেবরাণী সৌরভীকে বকতে লাগলো—এতক্ষণ কেন ডাকিস নি তুই, দেখ দিকিনি কত দেরী হয়ে গেল—

সত্যি সত্যি দেবরাণীর দেরা হয়ে গেছে। এখন গিয়ে কখনই বা সে করবে রান্না, আর কখনই বা লোকে খাবে! এতক্ষণ যদি শ্রীপতি এসে গিয়ে থাকে। অবশ্য এত শীঘ্রি শ্রীপতি খুব কম দিনই আসে, কিন্তু যদি এসে থাকে তো কী ভাবছে কে জানে। এই খাটুনি সারাদিন এই পরিশ্রমের পর বাড়ীতে এসে দেখবে দেবরাণী নেই! জুতো খুলে দেবে কে? হাত-পা ধোবার জল হয়ত দেওয়া হয়নি—মানুষ একলা অন্ধকার ঘরে হয়ত চুপ কোরে বসে আছে দেখ দিকিনি কাণ্ড! উনুনে আগুন দিয়েছে কি না, তুলসীতলায় সন্ধ্যে দেখানো হয়েছে কি না—উঃ কত

কাজ সংসারের। একঘণ্টা সংসারে না থাকলেই এই—আর যদি সে একদিন কোথাও যায় তা'হলে কী যে হবে দেবরাণী তা' ভাবতেও ভয় পেলে। সন্ধ্যেবেলা ধোপা আসবার কথা ছিল, হয়ত এসে ফিরে গেছে। ময়লা হোয়েছে সমস্ত কাপড় চোপড়, এক ক্রোশ দূরে তার বাড়ী, আসতে আবার সেই সাত দিন।

খিড়কীর দরজা দিয়ে দেবরাণী বাড়ী ঢুকলো—ঢুকে দেখলে : সে যা ভেবেছে তাই। দরজা হাট কোরে খোলা পড়ে আছে, যদি চোর-ডাকাত ঢুকতো! রাগে দেবরাণীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো। তা'হলে পয়সা দিয়ে চাকর রাখা কেন? সে পয়সা থাকলে তো সংসারের কত সাশ্রয় হয়। মানুষের রক্ত জল কোরে উপায় করা টাকা—এমনি কোরে তার অপব্যয়। কেন, কিসের জন্যে? দেবরাণী চীৎকার কোরে চাকরের নাম ধরে ডাকতে লাগলো…

আর একদিন—সন্ধ্যেবেলায়—যে সন্ধ্যায় বাঙালী গেরস্ত মেয়েদের কাজের অন্ত থাকে না—সেই ধূসর সন্ধ্যায় দেবরাণী উনুনে আগুন দিয়ে গা-ধুয়ে সবে তুলসীতলায় পিদিম নিয়ে যাবে—তুলসীতলায় আলো দেখিয়ে দেবরাণী রান্না ঘরে ঢুকবে—অর্থাৎ নিয়মমত যান্ত্রিক গতিতে তার রাত্রের কাজ সুরু করতে যাবে—এমন সময়—আঁচলের আড়ালে পিদিম নিয়ে সবে সে উঠানের সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছে—এমন সময় খবর এল। খবর পাঠিয়েছে শ্রীপতি। জানিয়েছে—হয়ত রাত্রে শ্রীপতি বাড়ীতে আসতে পারবে না, সুতরাং তার জন্যে ভাত যেন রাঁধা না হয়।

এই বিকেল বেলা, সন্ধ্যার একটু আগে দেবরাণীর বাঁ-চোখটা নাচতে সুরু করেছিল। দেবরাণীর মনে হয়েছিল : কী এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা তার পক্ষে মঙ্গলজনক। এমন হঠাৎ তার তো বাঁ-চোখ নাচে না।

কিন্তু তার ফলে যে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পাবে, তা কে জানতো। দেবরাণীর মনের সমস্ত উৎসাহ নিবে এল—কার জন্যেই বা রাঁধা! কেনই বা তবে এই কর্ম্মভোগ! দেবরাণী উনুনের উপর হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে এল। এসে শ্রীপতির জন্যে একটা রুমাল সেলাই করতে বসলো।

শোবার খাটের ঠিক মাথার দিকে দেয়ালে টাঙানো তাদের দু'জনকার ফোটো। পাশাপাশি শ্রীপতি আর দেবরাণী দাঁড়িয়ে—বিয়ের সময় তোলা। তখন দেবরাণীর কেমন চেহারা ছিল—শ্রীপতিও তখন একটু ছেলেমানুষ ছিল—ঠোঁটের ওপর পাতলা সরু একটুখানি গোঁফ—গায়ে চাদর, হাতে টোপর আর পায়ে পম্পসু; এখনকার সুটপরা শ্রীপতিকে দেখলে ও শ্রীপতিকে আরে চেনাই যায় না—এত তফাৎ। সেই বিয়ের সময়ের আর একটা কথা দেবরাণীর মনে পড়লো—

কথা ছিল বিয়ের আগের দিন সে আসবে। বাড়ীর পিছন দিকে বাগানের ভেতর হেনুহেনা গাছের আড়ালে সন্ধ্যেবেলা কেউ যখন থাকবে না, সেখানে সে আসবে; কত কথা বলার ছিল—শেষ দেখা; কত দিনের মতো, চির জীবনের মতো শেষ দেখা; শেষবারের মতো বল্‌তো 'ভুলো না'—শেষবারের মতো বলতো—'চিঠি দিও'—আর শেষবারের মতো সে মুখ নীচু কোরে ঠোঁটের ওপর চুমু খেতো—দেবরাণী তাতে এতটুকু বাধা দিত না, আনন্দে আর ব্যথায় দেবরাণী তাকে কোলে টেনে নিতো—তাকে দিত সান্ত্বনা—

এই ছিল ঠিক। কিন্তু সব উল্‌টে গেল; সেদিন সকাল থেকে দেবরাণীর এমন জ্বর হোল—সারাদিন অজ্ঞান, অচৈতন্য। দেহের তাপে বিছানা পুড়ে গেল। কী সে ভুল-বকা! প্রলাপে সে কী যে বলেছে

কে জানে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এতখানি দীর্ঘ দিন কোন্ ফাঁক দিয়ে কখন চলে গেছে—দেবরাণীর হুঁস ছিল না। হুঁস থাকবে কি কোরে? অসহ্য যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে পড়েছিল তার দেহ—শুকনো মুখ, শুকনো দৃষ্টি—যেন সারা জীবন সে খায়নি, সারা জীবন সে চান করেনি—জন্ম থেকে যেন সে কেবল অসুখে ভুগছে। অসুখ যখন তার কিছু কমলো, যখন তার একটু জ্ঞান হোল, তখন অনেক রাত হয়ত। তার মনে পড়লো সেই কথা। সে যে আসবে বলেছিল; আজ যে শেষ দেখার দিন! ধড়ফড় কোরে বিছানা ছেড়ে দেবরাণী উঠতে গেল, হঠাৎ সবাই মিলে তাকে ধরে শুইয়ে দিলে, তাকে সারা রাত ধরে পাহারা দিতে লাগলো। বিছানা ছেড়ে তাকে তারা একবারও উঠতে দেয়নি।

তার পরদিন দেবরাণীর বিয়ে হয়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে দেবরাণীর আর দেখা হয়নি। হয়ত সে সেদিন সন্ধ্যেবেলা হেস্নুহানা গাছের আড়ালে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবরাণীকে না দেখে ফিরে গেছে। হয়ত অভিমান কোরেছে! হয়ত আর সে আসবে না—তাকে হাজার ডাকলেও সে আর আসবে না।

এই এখন—এই সন্ধ্যেবেলা—দেবরাণী রুমাল সেলাই করতে করতে ভাবতে লাগলো: সে কী করছে! এতক্ষণ সে একটু বেড়িয়ে এসেছে—এসে লিখতে সুরু কোরেছে। লিখতে লিখতে যখন সে চেয়ার ছেড়ে ওঠে, উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করে—আর জান্‌লার বাইরে এক একবার অন্ধকার রাত্রির দিকে চেয়ে দেখে—তখন দেবরাণীকে কি তার মনে পড়ে! পাশে ধব্‌ধবে শাদা বিছানা—সেই একক শয্যা যখন তার অসহ্য হোয়ে ওঠে, তখন তার পাশে দেবরাণীকে কল্পনা কোরে সে কি তৃপ্তি পায়!—সে কল্পিত দেবরাণীর কানে কানে অশান্ত নীরব-প্রলাপ বকে বকে যায়!

সৌরভী ঘরে এসে বললে—ভাত হোয়ে গেছে মা,—

ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হোল। এতবড় বিছানায় দেবরাণী একলা শুয়ে ঘুমুচ্ছে! হঠাৎ অস্পষ্ট আর অস্ফুট শব্দে ঘরের নিস্তব্ধতা চম্‌কে উঠলো! শেষ রাত্রের চাঁদের মতো টিপিটিপি পায় কে যেন ঘরে ঢুকলো—দরজা বুঝি খোলা ছিল—দেবরাণী বুঝি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল—

—কে—কে—কে—বলে দেবরাণী বিছানায় উঠে বসেছে। হারিকেনটা নিবোতে ভুলে গিয়েছিল—সেটা জ্বলছে! সেই আলোয় দেবরাণী স্পষ্ট দেখলে সে এসেছে—এতদিন যাকে সে চাইছিলো সে এসেছে!

সে বললে—আমি এলুম দেবরাণী—

দেবরাণী। কী কোরে এলে তুমি? কেউ টের পায়নি? দরজা কে খুলে দিলে? পথ চিনতে ভুল হয়নি—সত্যি সত্যি কী কোরে এলে তুমি? চাকরেরা কেউ জানতে পারেনি?…তুমি কতক্ষণ এসেছো?

সে। আমি কখন এসেছি রাণু, তিনটের গাড়ীতে এসে তোমার বাড়ীর চারপাশে ঘুরেছি—কেবল ঘুরেছি—যখন দেখলাম সবাই ঘুমিয়েছে, যখন তোমার উড়ে চাকরটার গান থেমে গেল, দরজা বন্ধ কোরে তোমার ঝিও শুয়ে পড়লো—তখন আস্তে আস্তে আমি পাঁচিল বেয়ে উঠেছি, বাঘের মতো সাবধানে এসে তোমার ওপরের ঘরে পৌচেছি। তোমার ঘরে আলো জ্বলছিল—জানলা দিয়ে দেখলুম ঘরে তুমি একা—আর কেউ নেই, সেলাই করতে করতে তুমি শুয়ে পড়েছ—কিন্তু তোমার স্বামী কোথায় রাণু—শ্রীপতিবাবু!

দেবরাণী। তিনি তো নেই, একটা কলেরা কেসে অনেক দূর যেতে হয়েছে—আজ তিনি আসবেন না।…

সে। আসবেন না? ভালোই হোয়েছে—অনেক সময় পাওয়া

গেল।—শিগ্রি কোরে যাও রাণু—অনেক দূর যেতে হবে আমাদের—অনেক দূরে—যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, জানবে না আমরা কে! হয়ত এক সমুদ্রের ধারে, নয় কোনও বনের পাশে আমরা ঘর বাঁধবো!—শিগ্রি কোরে নাও—বেশি কিছু মোট-মোটরি নিও না যেন—আমি বেশি বইতে পারবো না, একটা শুধু ছোট দেখে সুটকেস্ নাও—আর নাও তোমার জামা-কাপড়—টাকা আমার কাছে যথেষ্ট আছে! এত টাকা; শুধু এই জন্যে এতদিন ধরে জমিয়েছি, দিনের পর দিন কেবল টাকা টাকা কোরে বেড়িয়েছি, আজ আমার সে আশা মিটেছে—আর কোনও ভাবনা নেই রাণু, গাড়ী ছাড়বে রাত তিনটেয়, তার আগে সমস্ত নিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছুতে হবে—তোমার কী কী নেবার নিয়ে নাও—

দেবরাণী। কোথায় যেতে বলছো আমাকে—কী বলছো?—কোথায় যাবো আমরা?…আমি বুঝতে পারছি না যে—

সে। তার কি ঠিক আছে—? যেখানে হোক গেলেই হোল অনেক দূরে, অনেক দূরে—এই পাঁচটা বছর কেবল ভেবেছি কোথায় যাবো, কিছুই ঠিক করতে পারিনি, আজ যখন বেরিয়ে পড়েছি, তখন আর যাবার জায়গার অভাব হবে না—চল, চল—

দেবরাণী নিথর নিশ্চল হোয়ে শুয়ে রইল। সে আবার বললে—সে কি উঠছো না যে—যাবে না?

—তার চেয়ে—দেবরাণী বললে: তার চেয়ে এখানেই তুমি থাকোনা। এই বাড়ীতে—এত ঘর পড়ে রয়েছে, এত জায়গা, কেউ আপত্তি কোরবে না, আমার স্বামীও আত্মভোলা মানুষ—তুমি আরাম কোরে এখানে থাকবে;—যেদিন রাত্রে আমার স্বামী বাড়ী ফিরবেন না, আমি আস্তে-আস্তে তোমার ঘরে যাবো—তুমি আমার যা আছো তাই থাকবে।

তোমাতে আমাতে থাকবে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধ। আর স্বামী? স্বামীকে আমি ভক্তি কোরব, শ্রদ্ধা কোরব—স্নেহ কোরব, সেবা কোরব—তাইতো বেশ! ওগো, তাই বেশ—আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই—বুঝেছ—এই এখানেই থাকো—

সে বললে—কেন তবে তুমি আমায় আসতে লিখেছিলে, যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাবে, কেন এই পণ্ডশ্রম! বুঝেছি, তোমাদের প্রেম শুধু লোক-দেখানো, শুধু মুখের প্রেম—একটু ঝড় বইলেই, তোমাদের প্রেম নিবে যায়, একটু ঢেউ উঠলেই তোমাদের প্রেম ডুবে যায়! জানো—এই পাঁচটা বছর কী কোরে কাটিয়েছি, কী কোরে এত টাকা জোগাড় কোরেছি—সব তোমার জন্যে রাণু—আর আজ তুমি বলছ—'যাব না'! কেন তুমি তবে আমাকে আসতে লিখেছিলে? আপত্তি তোমার কোথায়? কেন তুমি যাবেনা?…

দেবরাণী কী বলবে! দেবরাণী অনেকক্ষণ চুপ কোরে রইলো! কী তার বলবার আছে!

একটু পরে বললে—আমি কেমন করে যাই বল তো? আমি গেলে এ সংসার কে চালাবে? একঘণ্টা বাড়ীতে না থাকলে সমস্ত যে নয়-ছয় হোয়ে যায়। আমি যদি না দেখি তো এ ঘর-দোর-বাড়ী কে দেখবে, তুমি বলে দাও—! উনি যে মানুষ, আমি যদি সামনে একদণ্ড না থাকি, তাহোলেই চিত্তির—ভাত খাবার সময় কে পাখার বাতাস কোরবে? সরবৎ কোরে দেবে কে? নিজের জামার বোতাম ওর দিনে সাতবার হারিয়ে যায়—ওর মাথার চুল তা'ও আমাকে আঁচড়ে দিতে হয়—জুতোর ফিতে খুলে দিতে হয়! আমি কেমন কোরে যাই—তুমি এখন বলো? আমি গেলে কি চলে? এই পাঁচ বছরের নিজের হাতে গড়া সংসার—তুমি

তো জানোনা—এ সংসার ভাঙতে আমাদের কতো ব্যাথা লাগে। এর প্রত্যেকটি জিনিষ আমার কাছে প্রিয়—এই বিছানা বালিশ থেকে আরম্ভ কোরে ওই একটা ভাঙা ইটের টুক্‌রোটি পর্য্যন্ত। কেমন কোরে যাই বলো?

সে। বেশ, তবে তাই হোক, স্বামীই তোমার আপন হোক, আমি তোমার আজ থেকে কেউ নই। সত্যি সত্যি আমি আর বাড়ী ফিরে যাচ্ছিনে; যদি কোনও দিন কোনও এক মুহূর্ত্তে সমুদ্রের দিকে চেয়ে তোমাকে মনে পড়ে, আমি চলে যাব অরণ্যে—যদি বনের পাখীর গানে তোমার কথা মনে পড়ে—আমি চলে যাবো মরুভূমিতে, যদি নীল আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে তোমার চোখ মনে পড়ে, আমি আমার চোখ ত্থ'টো বুজে থাকবো—যদি আমার বাগানের ফুলের গন্ধ তোমার চুলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, আমি বাগান ভেঙে ফেলবো—যদি তাতেও তোমাকে ভুলতে না পারি আমি আত্মহত্যা কোরব,···বেশ, তাই হোক, আমি যাই এখন—।

দেবরাণী। না, যেও না, শোন, তুমি এখানেই থাকো, এই ঘর, এই বাড়ী, এখানে সমস্ত তোমার আপনার, কেউ কিছু বলবে না, আমি শুধু তোমায় সারাদিন দেখতে পাবো, তোমার কাছে থাকতে পাবো, তোমার সঙ্গে কথা কইতে পাবো, তুমি যেও না, তুমি গেলে আমি বাঁচবো না, ভেবে দেখ তুমি, এদের ছেড়ে কেমন কোরে আমি যাই, তুমি তো অবুঝ নও—আমি না হোলে এদের চলবে না; তুমিও থাক, এরাও থাকুক—আমি যে কাউকে ছাড়তে পরিনে, সেই ভালো—কোথায় কোন্ পথে মাঠে-ঘাটে ঘুরবে, আমি এখানে তোমায় আঁচলের ছায়ায় আরামে রেখে দেবো—তুমি থাকো—এখানে থাকো আমার কথা শোন—

সে। সে হয় না রাণু, আমাকে পেতে হোলে তোমার স্বামীকে ছাড়তে হবে, তোমার সংসার ছাড়তে হবে, তোমায় বাঁধন ছিঁড়তে হবে—তা' যখন তুমি পারবে না তখন আমি যাই, কিন্তু মনে রেখো, একবার যদি চলে যাই তবে আর আমি আসবো না—

অন্ধকারের ভেতর তার চেহারা অস্পষ্ট হোয়ে এল। সে চলে গেল। দেবরাণী হঠাৎ গুমরে কেঁদে উঠলো! নিজের কান্নাতেই দেবরাণীর ঘুম ভেঙে গেছে। সত্যি সত্যি দেবরাণী এবার উঠে বসলো! তবে সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলো! স্বপ্নের ঘোরে দেবরাণী এতক্ষণ কেবল কেঁদেছে নাকি!—দেবরাণী চোখে হাত দিয়ে দেখলে—চোখ ভিজে ফুলে উঠেছে, এই সারা রাত সে বোধ হয় অবিশ্রান্ত কেঁদেছে! বাইরে সকাল হোয়ে এসেছে—বেলা হয়েছে। অন্যদিন এর অনেক আগে দেবরাণী ঘুম থেকে উঠে পড়ে। কিন্তু সারা রাত এ কী দুঃস্বপ্ন! আচ্ছা, যদি সে সত্যি সত্যি আসতো! কাল রাতে একলা ঘরে পাঁচিল ডিঙিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যদি সে আসতো! কেন সে এল না, কেন অমন রাত বিফলে চলে গেল। সে এলে কী এমন দোষ হোত! ওরা কী করে ভুলে থাকে! কী কোরে ওরা ভুলতে পারে! তাকে কেন্দ্র কোরে দেবরাণীর সমস্ত অভিযোগ সমস্ত অভিমান ঘনীভূত হোয়ে উঠতো আবার। কেন সে আসে না! সে একবার আসে না কেন? তবে কেন সে ভালবেসেছিল? কী এমন তার কাজ। দেবরাণী কী দোষ করেছে। সে-ও তাকে ভুলতে বসেছে। দেবরাণীর কেউ নেই—কেউ নেই দেবরাণীর! কেন এমন হয়! সেই ভোর বেলা—অস্পষ্ট অন্ধকার আর অসীম আকাশের দিকে চেয়ে দেবরাণীর মনে হোল—কেন এমন হয়। দেবরাণীর কী যে হোল—সে কেঁদে ফেললে। যার জন্যে কাঁদা সে হয়ত জানতেও পারছে

না। কেন তবে বেঁচে থাকা। দেবরাণীর কেউ নেই, কেউ নেই দেবরাণীর। দেবরাণী আবার কাঁদতে লাগলো। সে যদি ভুলতে পেরেছে, দেবরাণী কেন ভুলতে পারে না। ওরা সব পারে—সব পারে ওরা! জানলার বাইরে একটুক্‌রো শিমুল তুলো হাওয়ায় উডতে উড়তে অনেক অনেক দূরে চলে গেল—দেবরাণী চেয়ে রয়েছে। ঘরের ভেতর হারিকেনটা তখনও জ্বলছে—

হঠাৎ দেবরাণীর মনে হোল—তাইতো। এই সকাল পর্য্যন্ত কোন আক্কেল সে শুয়ে আছে। কত তার কাজ পড়ে রয়েছে যে। সংসারে ছোট বড় সমস্ত কাজ। এই এখুনি শ্রীপতি এসে পড়বে—জলখাবার চাই। চান করবার জল চাই দু' বালতি। তারপর বাসি-কাপড় কেচে চান কোরে আবার রান্নার জোগাড় দেখতে হবে, চাকরকে বাজার আনতে পাঠাতে হবে—সৌরভী মাছ কুটতে বসবে—শ্রীপতির জন্যে মিছরি ভিজিয়ে রাখতে হবে—কাল থেকে চাল বাড়ন্ত, মুদীকে চাল পাঠাতে বলে দিয়ে আসতে হবে, কাঠ ফুরিয়ে গেছে—গয়লানী কাল আধ পোয়া দুধ কম দিয়েছে সে কথা আজ সে এলে বলতে হবে—কাজ কী কম। সংসার তো আর ছেলেখেলা নয়!

দেবরাণী বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো। উঠে বসতেই দেবরাণীর নজরে পড়লো তার বিছানার ওপর বুকের কাছেই কালকের রাতের আর্দ্ধ-সমাপ্ত রুমালটা পড়ে আছে, আর তারই ওপর লাগানো রয়েছে একটা ছুঁচ। সেলাই করতে করতে সে কাল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে হুঁস ছিল না। যদি ছুঁচটা তার বুকে ফুটে যেতো! কী হোত তা'হলে—দেবরণী বিছানায় বসে বসে ভাবতে লাগলো: কী হোত তাহ'লে? ওই এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি লম্বা চক্‌চকে ছুঁচটা যদি তার নরম বুকে বিঁধে যেতো!

বিঁধে গেলে সে কি বাঁচতো ! ভাগ্যিস বেঁধেনি—দেবরাণীর বরাত ভালো ! কিন্তু একবার বিঁধলে কি আর রক্ষা থাকতো ! সে কি বাঁচতো ! দেবরাণী সেই বিছানার ওপর বসে বসে কোন্ অদৃশ্যশক্তিকে লক্ষ্য কোরে প্রশ্ন কোরতে লাগলো—সে কি বাঁচতো ! ওই চক্‌চকে ছুঁচটা তার নরম বুকে বিঁধলে সে কি বাঁচতো

ক্রিয়াকাণ্ড

টাউন-ইস্কুলের অবিনাশ মাষ্টারের নাম ডাক আছে। ছেলে ঠেঙাইয়া মানুষ করিতে অবিনাশ মাষ্টার ওস্তাদ। এতটুকু ফাঁকি দিবে না—দুঘণ্টা পড়াইতে গিয়া ভুল করিয়া তিন ঘণ্টা পড়াইয়া বসিবে। পান নয়—নস্যি নয়—তামাক নয়—সম্পূর্ণ খাঁটি মানুষটি—কাহারো সাতে নাই, পাঁচে নাই—মাসকাবারে ইস্কুল হইতে তিরিশটি টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট।—অবিনাশ মাষ্টারকে কেহ কোনদিন হাসিতে দেখে নাই। মোটা চশমার ফাঁক দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা…ছেলেদের দিকে তাকাইয়া কী অনবরত বকিয়া যায়—

এই অবিনাশ মাষ্টারই একদিন কৃষ্ণচরণের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গেল। সকালবেলা বাড়ীতে খবরের কাগজ আসে। চান করিতে যাইবার আগে অবিনাশের চোখ দু'টি তাহারই উপর ঘোড়-দৌড় সুরু করিয়া দেয়। কোথায় কি যুদ্ধ হইল, কে কি বক্তৃতা দিল, তাহা লইয়া অবিনাশ কোনও দিন মাথা ঘামায় নাই—তবু নেশা।—নেশা করিয়া লোকে কতদিকে কত পয়সা উড়াইয়া দেয়—ওই নেশার জন্য প্রত্যহ দু'টি আনা অবিনাশের নির্জ্জলা খরচ হয়।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় আসিয়া অবিনাশ দাঁড়াইয়া গেল। গ্রামের নাম মধুহাসি। নামটা তাহার পরিচিত। অবিনাশ দ্রুত পড়িয়া চলিল—কে একটি পাগলী-মেয়ে বাড়ীর ছাত হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে, পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।…ইত্যাদি ইত্যাদি।…

পড়িতে পড়িতে অনেকদিন আগে একটি মেয়ের কথা অবিনাশের

হঠাৎ মনে পড়িল। একটি আদুরে মেয়ে—লেখাপড়া শিখিতে চাহিত না—কেবল যত রাজ্যের খুনসুড়ি করিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিত। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিত জামা নাই—ঘুম ভাঙিবার আগে কে জল ছিটাইয়া পলাইয়া যাইত—তারপর ধরা পড়িলে কোথায় অপরাধের জন্য লজ্জিত হইয়া উঠিবে তা' নয়—হাসিয়া লুটাপুটি খাইত।…খবরের কাগজ রাখিয়া অবিনাশ সেই সব দিনেব কথা ভাবিতে লাগিল।…

অবিনাশ দূর সম্পর্কের একরকম আত্মীয় হইত। কর্ত্তা উমানাথ বলিলেন—তুমিও পড়—নাতনীটাকেও একটু একটু পড়াও। সেইদিন হইতেই সুধা অবিনাশের ছাত্রী হইয়া গেল। মেয়েটি বেয়াড়া হইলেও তাহাকে মানুষ করা যাইত, কিন্তু সুধা মানুষ হইবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিল।

নেশা বৈকি—খবরের কাগজ পড়িয়া রহিল—অবিনাশ ভাবিতে লাগিল—এতদিন সুধা কেমন হইয়াছে একবার দেখিলে হয়। ছেলে পুলে হইয়া ঘর ভরিয়া গিয়াছে হয়ত—গিন্নী সাজিয়া চারিদিক তদারক করিয়া বেড়ায়। তাহার কি এখন কিছু ভাবিবার সময় আছে? বৃহৎ পরিবার—সেই রকম দুষ্টু মেয়েটিকে এখন গিন্নী সাজিলে কেমন দেখাইবে তাহাই কল্পনা করিতে গিয়া অবিনাশ খুব খানিকটা হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই সব দিনের একটি তুচ্ছ ঘটনা অবিনাশের মনে পড়িল—

সকালবেলা পড়িতে বসিবার কথা। কিন্তু বেলা হইয়া গেল—তবু সুধার আসিবার নাম নাই। শেষে অবিনাশ উঠিয়া নিজেই খুঁজিয়া আনিতে গেল। বাড়ীর ভিতর অবিনাশের অবাধ গতি। সুধা যে ঘরে শুইত সেখানে নাই—জ্যাঠাইমা বলিলেন—সেকি আর এখন ঘুমোয় অবিনাশ কোন সকালে উঠে গিয়েছে।…অতঃপর বাড়ীর ভিতর কোথাও

নাই—অবিনাশ বাড়ীর বাহিরে খুঁজিতে গেল। বাহির-বাড়ীর পিছন দিকে ফলের এবং ফুলের বাগান। জাম তখন পাকিয়াছে—নিশ্চয় সেখানে গিয়াছে মনে করিয়া অবিনাশ গিয়া দেখে বাগান শূন্য কেহ নাই। অবিনাশ বড মুস্কিলে পড়িল। এই রকম যদি ছাত্রীকে রোজ খুঁজিয়া আনিয়া পড়াইতে হয় তবেই হইয়াছে।...পাড়ায় হয়ত কাহারো বাড়ী গিয়াছে এই ভাবিয়া অবিনাশ পাড়াটাও ঘুরিয়া আসিতে যাইতেছিল। কিন্তু ভাগ্য তাহার সুপ্রসন্ন।...মনে হইল পালেদের রথের ভেতর হইতে কে যেন উঁকি মারিতেছে—ও নিশ্চয় সুধা! প্রকাণ্ড রথ নীচের তলায় একেবারে অন্ধকার—অবিনাশ গিয়া ডাকিল—ও সুধা, সুধা—তোমায় পড়তে হবে না—বেরিয়ে এস—এস—কিচ্ছু বোলব না—বেরিয়ে এস—কিন্তু সুধা কথায় ভুলিবার নয়—উচ্চবাচ্য কিছু নাই!...অবিনাশ জাম গাছ হইতে পাকা পাকা জাম সমেত একটি ডাল বাড়াইয়া দিল—এবার ফল ফলিল—যেমন ডালে টান পড়িয়াছে অমনি অবিনাশ অন্ধকারের ভিতর হাত বাড়াইয়া তাহার গলা ধরিয়া ফেলিয়াছে—ধরিতেই ব্যা ব্যা শব্দ করিতে করিতে একটি ছাগলছানা বাহির হইয়া আসিল।—অবিনাশ দস্তুর মত ঠকিয়াছে। যাক্ কেহ কোথাও দেখিতে পায় নাই—কিন্তু যাহার জন্য এত—অবিনাশ ঘরে আসিয়া দেখে সে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পড়িতেছে—She can fly but the fox cannot—

ভাবিতে ভাবিতে হুঁস্ হইল—বেলা হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির শিশি হইতে এক খামচা তেল লইয়া মাথায় দিতে দিতে চীৎকার করিয়া বলিল—ও কেষ্টা—ভাত দিতে বল—

পাগলা মাষ্টার বলিলে ছেলেরা অবিনাশকেই বুঝিত।...টিফিনের ঘণ্টায় ছোট মাষ্টাররা সবাই আসিয়া ছোট ঘরখানিতে জড় হয়। অবিনাশ ভিতরে

আসিয়া কোণের দিকে জায়গা করিয়া লইল।—স্কুলের মাঠময় ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া দৌড়ঝাপ লাগাইয়া দিয়াছে।

ছোট ঘর—গরমে সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার জোগাড়। ছ'খানি পাখা, তাহাই হাত হইতে হাতে ফিরিতেছে।···হেড পণ্ডিত একটি কাগজের বাণ্ডিল দেখাইয়া বলিলেন—পূজো এখন কোথায় ঠিক নেই—এরি মধ্যে দশ টাকা ফাঁকা খরচ হয়ে গেল—।

বৃদ্ধ রাইচরণবাবু বলিলেন—পরিবারের জন্যে কি কি নিলেন পণ্ডিত-মশাই—

পণ্ডিত মশাই বাণ্ডিলটি খুলিতে খুলিতে বলিলেন—দশটি টাকায় ক' গণ্ডা জিনিষ হবে আবার—ওই একটি তাও কি মনের মত হোল !—এই দেখুন না—

পণ্ডিত মশাই শাড়ীটি খুলিয়া লম্বা করিয়া ধরিলেন। ধরিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। আশা করিয়াছিলেন সকলেই হয়ত 'বেশ' কিম্বা অমনি একটা কিছু বলিবে—কিন্তু হিংসুকের দল—জাত হিংসুক—কাপড়টা হাত দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া সকলেই দেখিল—দাম লইয়া আলোচনাও চলিল—কিন্তু ভুলিয়াও কেহ ভাল বলিল না !—হেড পণ্ডিত নিরাশমনে বাণ্ডিলটি আবার বাঁধিতে লাগিলেন।—

কথার মোড় অন্যদিকে ফিরিল—। রাইচবণবাবু বলিলেন—ছুটি এবার পিছিয়ে গেল শুনেছ বোধ হয়—

সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—কেন—কেন—

রাইচরণ বলিলেন—ছেলেরা মাইনে দেয়নি—

একজন ছোকরা মাষ্টার বলিল—ওসব ভয় দেখান—সত্যি কি আর ছুটি পেছোয়—ও রকম ঢের শুনে আসছি—হেড মাষ্টারের হুম্‌কি—

হেড পণ্ডিত এতক্ষণ নিজের দুঃখে বিমর্ষ ছিলেন—এসব কথায় কান দেন নাই—হঠাৎ ছুটি পিছাইয়া যাইবার কথাটা কানে যাইতেই চকিত হইয়া বসিলেন, বলিলেন—ছুটি পিছিয়ে গেল—তাই নাকি ?—কেন ?—দেশে যে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি—জিনিষপত্র কিনে—শেষে—

হেড পণ্ডিত মশাই বাহির হইয়া গেলেন।—অবিনাশের পাশে বসিয়া পরিতোষবাবু তামাক খাইতেছিলেন, বলিলেন—দেখলে অবিনাশ তৃতীয় পক্ষের বিয়ে করে পণ্ডিত পাগল হয়ে গেছে—চিঠি দেখনি ?···খামে চিঠি লেখে হে—এই বুড়ো বয়েসে—এতো মাগ্যির বাজারে—নীল খামে—

অবিনাশ হাঁ-হুঁ কিছু করিলনা দেখিয়া পরিতোষবাবু রাইচরণকে মুরুব্বি ধরিলেন। বলিলেন—বুঝলেন রাইবাবু—এ ঘর থেকে নাকি তামাক খাওয়া উঠিয়ে দেবে, সিঁড়ীর নীচে ঘরখানায় তামাক খাবার ঘর হবে—এত ইস্কুলে মাষ্টারী করে এলাম মশাই—এমন আইন তো কোথাও নেই—

রাইবাবু বললেন—দিন হুঁকোটা বাড়িয়ে—আজ তামাক খেতে দেবেনা—কাল বিড়ি খেতে দেবেনা—শেষকালে কোনদিন

ছোকরা মাষ্টারটি কথা শেষ করিলেন—শেষকালে কোনদিন বলবে মাথায় টেরি কাটতে পারবে না—বললেই হোল ছেলেরা খারাপ হয়ে যাবে—বলিয়া ছোকরা মাষ্টার নিজের চুলের উপর সযত্নে হাত বুলাইয়া লইলেন —

অবিনাশ ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। হেড পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—বলে এলাম।—মশাই ছুটি না দেন—রিজাইন দিতে হবে—

ছুটির পর অবিনাশ হেড পণ্ডিতকে ধরিল বলিল—পণ্ডিত মশাই—

কাপড়টা কোন দোকান থেকে কিনলেন—আমার যে একটা দরকার ছিল।—

পণ্ডিত মশাই এই অবিনাশকে খাঁটি লোক ভাবিতেন। এত মাষ্টার আসিল গেল—তাহারই চোখের সম্মুখে—কিন্তু এমন নিরহঙ্কারী এমন নির্লোভ মানুষটি আর তিনি দেখেন নাই। বলিলেন—কাকে দেবে, পরিবারকে বুঝি?

—আজ্ঞে তা' ছাড়া আর কে—

পণ্ডিত মশাই চটু করিয়া বলিলেন—দিও দিও—দেবে বৈকি—দেবে বৈকি।—আমাদের তো কত পয়সা কত দিকে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—কত পয়সা—যাচ্ছে না?—এই একটা পয়সাই কি কম?—এই যে তুমি পান খাও না—তামাক খাওনা—ওইতেই কি কম পয়সা বাঁচে ভেবেছ?—হিসাব করে দেখলে তাইতেই একটা বাড়ী তোলা যায়—তাই ভাবি—ছোটবেলায়—মার্বেলই খেলেছি কত পয়সার—আজে-বাজে খেয়েছিই কত কী—চিরস্থায়ী কিছু নেই—তা-ই জমালে আজ কত পয়সা ভাবদিকিনি—ভাবদিকিনি একবার—

অবিনাশ আপনমনে সেই কথাই ভাবছিল।

সুধা তখন বড় হইয়াছে।—চড়কের মেলা দেখিতে গিয়া—অবিনাশ সুধাকে একটি বিলাতী মোমের পুতুল কিনিয়া দিয়াছিল—দাম নিয়াছিল দু'টাকা। দু'টাকা—এখন ভাবিলে অবিনাশের গায়ে জ্বর আসে। ন দেবায় ন ধর্ম্মায় দু'টি টাকা একটা পুতুলের জন্য ব্যয়! লোকে বলিবে কি?—কিন্তু তখন ওই পুতুলটি সুধাকে কিনিয়া দিয়া অবিনাশ যে আনন্দ পাইয়াছিল—সে আনন্দ আর জীবনে পায় নাই। জ্যাঠাইমা বলিয়াছিলেন—ও অবিনাশ—এ করেছ কি—এই আঁখকুটে মেয়ের হাতে

এই দিয়েছ—ওকি আর থাকবে ভেবছ ?—এখুনি রাত না পোয়াতে গুঁড়ো করে ফেলবে—

কিন্তু সে পুতুল ভাঙে নাই। সেই পুতুলের পোষাক তৈরী হইল—পাড়ারই কোন একটি মেয়ের পুতুলের সঙ্গে আবার তাহার বিবাহ হইল—অবিনাশ সে বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছে।—

অবিনাশ বলিল—ছোটবেলায়—বুঝলেন পণ্ডিত মশাই—বয়স তখন ষোল সতের—আমি আমার এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে থেকে পড়তুম—সেই সময়ে বোকামি দেখুন দু'টাকা দিয়ে একটা পুতুল কিনে দিয়েছিলাম একটি মেয়েকে—

হেড পণ্ডিত মশাই লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—দু'টাকা—পুতুলের দাম—কি পুতুল হে?—এই তো সেদিন আমার শালীকে দিয়েছি একটা কিনে—তা' চার আনার কমে ছাড়লে না—তা' ব'লে দু'টাকা পুতুলের দাম—ঠকিয়ে নিয়েছে—ছেলেমানুষ দেখেছে—ঠকিয়ে নিয়েছে—

রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পর অবিনাশ বিছানার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

এক বছরের পরে আবার দেশে যাওয়া।—

সত্যবালা এখন অন্ধকার রান্নাঘরের দাওয়াটার উপর রাঁধিতেছে বোধ হয়। রান্নাঘর হইতে শোবারঘরের মেঝেটা নজরে পড়ে। টুকুটা হারিকেন জ্বালাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া দেহ দোলাইয়া একমনে পড়িয়া যাইতেছে। মিনু হয়ত হারিকেনের কাছে আলোর পোকাগুলি লইয়া খেলা জুড়িয়া দিয়াছে।

সত্যবালা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—আর পড়তে হবে না—ছেলের খুব পড়া হয়েছে—সারাদিন দস্যিপনা করে রাতের বেলা তেল পুড়িয়ে পড়া—দে আলো নিবিয়ে দে—তেল বড় সস্তা না?—আসুক না সে—সব তোলা রইল—তখন খেয়ো মার—

মিনু মার বাধ্য—বলিতে না বলিতে সে আলো নিবাইয়া দিয়াছে। টুকু ভয়ে আৎকাইয়া উঠিয়া ভীষণ চীৎকাব করিয়া একেবারে হাউ মাউ করিয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িবার জোগাড়। রান্নাঘর হতে সত্যবালা ছুটিয়া আসিয়া টুকুকে বুকের মধ্যে পুরিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা—এই তো আমি রয়েছি—এই তো—তারপব মিনুর উপর মার। মেয়ে যেন দিন দিন ধিঙ্গী হয়ে উঠেছেন। যাবেন তো পরের বাড়ী—লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরবে সেখানে।—কাজ নাই তো কেবল নষ্টামি আর খুনসুড়িতে ওস্তাদ।

ছোট টিনের বাড়ী—চারিদিকে জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। বাঁশঝাড় আসিয়া রান্নাঘরের চালের উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছে। বর্ষার দিনে টিনের চাল দিয়া জল পড়ে—উই ধরিয়া বাঁশের ও শালের খুঁটি গুলি সব শেষ করিয়া দিয়াছে—তিরিশ টাকা মাহিনার উপর সমস্ত নির্ভর। দেশে কতখানি দেনা বাড়িয়াছে—পূজোর মাসটা যাক—দশটা টাকা দিয়া সত্যবালার জন্য একখানা শাড়ী সে লইয়া যাইবে। কিছুই সে দিতে পারে নাই—দু'টি ছেলেমেয়ের জন্য সামান্য কিছু লইলেই চলিবে।—

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে।—তক্তপোষের তলায় ইঁদুরের নাচন চলিয়াছে—একটু যা ঘুম আসিয়াছিল—তাহাও ভাঙিয়া গেল।…অবিনাশ ভাবিতে লাগিল। মধুহাসির সেই ঘরটিতে সে এমনি করিয়া শুইয়া থাকিত।—স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন ভোর হইয়া যাইত—সুধা আসিয়া

ঠেলিয়া ঠুলিয়া ঘুমকে দিত নির্ব্বাসন।—কিন্তু তবু তাহাই অবিনাশের ভাল লাগিত।

একটা দিনের কথা মনে আছে। সুধার বিবাহের কথা হইতেছে।—কাহারা দেখিতে আসিবে। লোকজন আসিয়া গিয়াছে।...বাড়ীসুদ্ধ হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—

সিল্কের জামা পরিয়া বাহিরের ঘরে কয়েকজন লোক আসিয়া হাজির হইল। জ্যাঠামশাই অবিনাশকে বলিলেন—অবিনাশ দেখ ভেতরে কতদূর কী হোল—কিন্তু অবিনাশ ভিতরে গিয়া দেখে—সকলেই ভয়ে আতঙ্কে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া আছে—সবই প্রস্তুত—সুধাকে পাওয়া যাইতেছে না। আশ্চর্য্য কাণ্ড অমন মেয়ে যে আগেভাগেই এরূপ কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে তাহা পূর্ব্বেই সকলের জানা উচিত ছিল—কিন্তু তখন আর উপায় নাই। অবিনাশ সারাবাড়ী অলি-গলি খোঁজাখুঁজি করিল।...ওদিকে দেরি হইয়া যাইতেছে—এমন কেলেঙ্কারীর কথা তাহাদেরও বলা যায় না।—জ্যাঠামশাই বাহিব হইতে তাগাদা দিতেছেন—ও অবিনাশ দেরি কেন?

অবিনাশ বলিয়া আসিল—আর একটু দেরি হবে জ্যাঠামশাই—একটু—কিন্তু তখনও মেয়ে পাওয়া যায় নাই। রথতলা দেখা হইল—বাগান দেখা হইল—ডাকাডাকি যতটা সম্ভব হইল—কিন্তু মেয়ে যে কোথায় লুকাইল তাহার আর পাত্তাই নাই। বাড়ীতে আর একটা মেয়ে নাই যে তাহাকে দেখান হইবে। কী হইবে, কী হইবে হইতেছে—এমন সময়ে অবিনাশ নিজের ঘরে আসিয়া দেখে—তাহারই খাটের উপর—তাহারই লেপ চাপা দিয়া সুধা চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। লেপ খুলিতেই সুধা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল—ও মাষ্টার মশাই আপনার

দু'টি পায়ে পড়ি—কাউকে বলবেন না—দু'টি পায়ে পড়ি—জ্যাঠামশাই বকবে—

অবিনাশ বলিল—কেন ভয় কিসের তোমার—ওরা তোমায় খেয়েও ফেলবে না—কিছুই না—বিয়ে করে নিয়ে যাবে—বেশ ধুমধাম—বাজনা বাজবে—দেখোনা তখন—

সুধা রাগ করিয়া বলিয়াছিল—না আমি বিয়ে কোরব না ওদের—

সুধার অনুনয় বিনয়ে সেদিন কাজ হয় নাই—অবিনাশ সেই পলায়নপরা সুধাকে ধরিয়া সাজাইয়া গুজাইয়া বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেদিন সুধার কী রাগ।—পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া অবিনাশ দেখে তাহার বিছানার কাছে মাথার উপর দেয়ালের গায়ে কে লিখিয়া রাখিয়াছে—"মাষ্টার মশায় ভারী দুষ্টু।"

সেই সব দিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অবিনাশ তন্ময় হইয়া গেল।—

কিন্তু একদিন সত্য সত্যই সুধার বিবাহ হইয়া গেল। সারা বাড়ী ধুমধাম। অবিনাশের সেদিন খুব কষ্ট হইয়াছিল।···কোনও কারণ নাই—কিন্তু অবিনাশ নিজেই বলিতে পারেনা কেন—যখন সুধা প্রথম শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল—ষ্টেশনের ধারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিনাশ কত কী ভাবিয়াছিল।—

তারপর দেশে ফিরিয়া অবিনাশের নিজেরই একদিন বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু সেই হইতে অবিনাশ হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। স্কুলের ছেলেরা তাহাকে পাগল মাষ্টার বলিয়া ডাকে—অবিনাশ তাহা জানে। কিন্তু জানিয়াও অবিনাশ আরও গম্ভীর হইয়া থাকে।—হেড পণ্ডিত ঠিকই বলিয়াছে—এই যে তুমি পান খাওনা—তামাক খাওনা—ওইতেই কি কম পয়সা বাঁচে ভেবেছ?—হিসেব করে দেখলে তাইতেই একটা বাড়ী তোলা

যায়—তাই ভাবি—ছোটবেলায় মার্কেলই খেলেছি কত পয়সায়—আজে-বাজে খেয়েছিই কতকী—চিরস্থায়ী কিছু নয়—তা-ই জমালে কত পয়সা হোত ভাবদিকিনি—ভাবদিকিনি একবার—

অবিনাশ ভাবিতে লাগিল: বোকামি সে অনেক করিয়াছে—কিন্তু সেই যে দু'টাকা দিয়া একটা বিলাতী পুতুল কিনিয়া সুধাকে দিয়াছিল—সেরূপ বোকামির তুলনা নাই— !…সেই দু'টাকার শোকে আজ অনটনের দিনে অবিনাশের চোখে জল আসিল।

তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—দেশে তাহার ছেলেমেয়ে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। এই যে পূজা আসিতেছে—সত্যবালা ভাবিতেছে—স্বামী তাহার কতকি লইয়া যাইবে—বাড়ীর দাওয়া হইতে দূরে ষ্টেশনের পথের বাঁকা সাঁকোটি দেখা যায়—সেইদিকে চাহিয়া সত্যবালা দিন গোনে।

শীতের সকালবেলা টুকু গায়ে দোলাই বাঁধিয়া মুড়ি খাইতে বসিয়াছে—মিনু সকালে পান্তাভাত খাইয়াছে সুতরাং মুড়ি সে পায় নাই—টুকুর কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—ওটুকু তোর খাওয়া হোয়ে গেলে আমায় একটু দিস্ ভাই—দিবি তো?—

টুকু বলিল—দেবো বোস্ এখানে—

টুকু খাইতে লাগিল—তাহার হাতের ওঠা-নাবার সঙ্গে সঙ্গে মিনুর চোখও উঠিতে নাবিতে লাগিল। কিন্তু সবকটি মুড়ি শেষ করিয়া টুকু খালি বাটিটা আগাইয়া দিয়া বলিল—এই নে—খা—

মিনুর রাগিবারই কথা।—রাগের মাথায় মিনু চট্টাস করিয়া টুকুর গালে এক চড় বসাইয়া দিল—আর কোথায় যায়—টুকু সশব্দে পাড়া মাতাইয়া কান্না জুড়িয়া দিল। কান্না শুনিয়া মিনু পলাইয়াছে—সত্যবালা

আসিয়া ছেলেকে শান্ত করিলেন।—আসুক সে মেয়ে পিঠ আর আস্ত রাখছি নি—তুমি কেঁদোনা টুকু—

টুকু অমনিতে শান্ত হইল না নূতন করিয়া মুড়ি আসিল মুড়কী আসিল নাড়ু আসিল। পালাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মিনুর তখন ক্ষুধা পাইয়াছে—এক ফাঁকে ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দুপুর গড়াইয়া গেল—মিনু কোথায় গেল—সত্যবালা ভাবিয়া অস্থির। তাহার খাওয়া হইল না। এ বাড়ী ও বাড়ী খোঁজা হইল—অভিমানী মেয়ে কোথায় গেল—কে জানে। সত্যবালার চোখে জল আসিল। বাড়ীতে একটা লোক নাই—গিয়া খুঁজিয়া আনিবে।·· কিন্তু শেষে দেখা গেল ঘরে লেপ চাপা দিয়া মিনু শুইয়া আছে। তখন ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইয়া সাধিয়া খাওয়ানোর পালা।

অতি তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনা—অবিনাশ অন্ধকার ঘরের ভিতর শুইয়া কল্পনা-সৌধ গড়িয়া তুলিল।

একটা থার্ডক্লাশ কামরা দেখিয়া অবিনাশ ট্রেনে উঠিয়া পড়িল। হাতের বাণ্ডিলটি একপাশে ভাল করিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেশের ষ্টেশনে যখন এ ট্রেন পৌঁছিবে তখন রাত্রি।···সেই রাত্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তবে বাড়ী। বাড়ীর বাহিরে গিয়া অবিনাশ ডাকিবে—টুকু, ও টুকু টুকুরে—টুকু মিনু সবাই তখন ঘুমাইতেছে। দোর খুলিবে সত্যবালা।

হারিকেন জ্বালা হইবে। সত্যবালা ঘটি করিয়া পা ধুইবার জল আনিয়া দিবে—গামছা দিবে—তারপর পাখা আনিয়া বাতাস করিবে। জিজ্ঞাসা

করিবে কেমন ছিলে—রোগা রোগা দেখাইতেছে যে—শরীরের যত্ন না লইলে—ক'দিন টিকিবে ইত্যাদি।—অবিনাশ গাড়ীতে বসিয়া তখনকার সমস্ত ঘটনাটি কল্পনায় আনিতে পারে। সত্যবালা বলিল—ওতে কি, ওই যে কাগজে মোড়া ?

—তোমাব কাপড়—

—কেন আমার আবার কাপড় আনতে কে বললে—সত্যবালা খুব খানিক রাগ করিবে।

অবিনাশ বলিবে—কেউ না বলুক—আমাব বুঝি দিতে ইচ্ছে কবে না।

—দিতে ইচ্ছে করলেই বা—আব তোমার পায়ে যে জুতো নেই—জামা ছিড়ে গেছে—সে দিকে দেখেছ—

অবিনাশ বলিবে—হ্যাঁ ইস্কুল মাষ্টাবেব আবাব জামা কাপড়—আমাকে সবাই পাগলা মাষ্টার বলে—তা জান—

—বলবেই তো।—

সত্যবলা যতই বলুক—শাড়ীটা বাব বার কবিয়া ঘুবাইয়া ফিরাইয়া দেখিবে।—পছন্দ তাহাব নিশ্চয়ই হইবে। শাড়ীখানি পরিলে সত্যবালাকে কেমন মানাইবে—গাড়ীব এককোণে বসিযা অবিনাশ তাহাই ভাবিতে লাগিল।·· দেশের ছোট বাড়ীখানি ঘিবিয়া আবার কল-কোলাহল উঠিবে। সকাল সন্ধ্যা দুই শিশুকে লইয়া যতবাজ্যেব গল্প। চাঁদের আলোয় বসিয়া স্কুলের ছেলেদের গল্প, শহবের গল্প—কত গল্প অবিনাশ বলিবে—ওদিকে সত্যবালা তাড়া দিবে—হারিকেনটা কেন মিছি মিছি জ্বলছে—চাঁদের আলোয় তো বেশ দিব্যি দেখা যায়।

সংসারের স্বচ্ছলতা আনিবার সত্যবালার কি প্রযাস '···

ছেলেটার জন্য একটা পাঞ্জাবী কিনিয়াছে মেয়েটার একটা ডুরে-

গাড়ী। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চলিয়া যাইতেছে। পান নয়—চা নয়—চুপ করিয়া বসিয়া থাকা—অবিনাশের কোনও অসুবিধা নাই। হঠাৎ কী একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল—অবিনাশ উঁকি মারিয়া দেখিল—মধুহাসি।

অকস্মাৎ কী হইল কে জানে—অবিনাশ পোঁটলাটি হাতে করিয়া লইয়া নামিয়া পড়িল। সেই পুরানো ষ্টেশন—চিনিতে এতটুকু অসুবিধা নাই। সুধা হয়ত পূজার সময় এখানে আসিয়াছে—একবার দেখা করিয়া গেলে হয়।...পরিচিত পথ—অবিনাশ হাটিয়া চলিল। দেখা হইলে প্রথমে কী কথা হইবে কে জানে। অবিনাশের মনে হইল লোকে যে তাহাকে পাগল বলে—তা' ঠিকই। এখন কোথায় সে দেশে যাইবে, দেশে গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে তা নয়—কবেকার পরিচিত দূরসম্পর্কের আত্মীয় কে একটি মেয়ে সুধা, তাহাকে দেখিতে সে চট্ করিয়া নাবিয়া পড়িল। জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতে পূজা হয়—ধূমধামের সে বাড়ীতে আর অন্ত নাই। একবার শুনিলে হয় যে অবিনাশ আসিয়াছে অমনি সুধা মাষ্টার মশাই মাষ্টার মশাই বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিবে—ঠিক আগেকার মত মষ্টার মশায়ের হাত ধরিয়া এ পাড়া ও পাড়া সাতপাড়া বেড়াইতে যাইবে। সমস্তটা দিন অবিনাশকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিবে।—অবিনাশ পা চালাইয়া চলিল।—অবিনাশের একটু দুঃখ হইল—সুধার জন্য তো কিছুই আনা হয় নাই—যদি ঠিক থাকিত এখানে নাবিবে তাহা হইলে একটা কিছু আনিত বৈকি! এখন আর উপায় নাই।—

অবিনাশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল সর্ব্বাঙ্গ চেলী-মণ্ডিত বধূ অবিনাশের খাটের খুরো জড়াইয়া ধরিয়া আছে—যে আসিতেছে তাহাকেই মারিতেছে—ঠেলিয়া দিতেছে, আবদার ধরিয়াছে—শ্বশুরবাড়ী সে কিছুতেই

যাইবে না! যাইবে না—যাইবে না—কে কি করিতে পারে—করুক।—ওদিকে পাল্কীর ভিতর বর প্রস্তুত—লোকজন হাজির।—আদুরে মেয়েকে লইয়া মহা মুস্কিলেই পড়া গেল।—

ভিতরে আসিয়া জ্যাঠামশাই পর্য্যন্ত সাধিয়া গেলেন—কিন্তু পাথরের শিবকে সাধিলেও বর পাওয়া যাইত—সুধা এতটুকু নড়িল না। শেষে ধরিয়া বাঁধিয়া পাল্কীতে তুলিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল—কিন্তু তাহার আর দরকার হইল না—অবিনাশ আসিয়া একবার অনুরোধ করিতেই সুধা রাজী হইল। কিন্তু যাইবার আগে দেয়ালের গায়ে যেখানে লেখা ছিল—'মষ্টার মশায় ভারী দুষ্টু!'—সেইদিকে চাহিয়া রাগে গট্‌গট্‌ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

আজ এতদিন পরে সেই সব কথা সুধাকে মনে করাইয়া দিলে সুধা রাগিয়া উঠিবে না হাসিবে অবিনাশ তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সুধা যা মেয়ে—অবিনাশ পৌঁছিলে সে একাই হয়ত হুলস্থূল বাধাইয়া দিবে। তাহাকে খুব লজ্জায় ফেলিবে যাহোক। ঠাট্টাও কি কম করিবে—স্নান করিয়া আসিয়া হয়ত দেখিবে—ফরসা কাপড়টা কে ভিজাইয়া দিয়াছে—ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিবে—জুতাজোড়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।...

দেখিতে দেখিতে বাড়ী আসিয়া গেল। সেই পরিচিত বাড়ী! ভিতরে জ্যাঠামশাই বসিয়াছিলেন—এখন আরও বৃদ্ধ হইয়াছেন। অবিনাশ গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। জ্যাঠামশাই বলিলেন—যাও অবিনাশ ভেতরে যাও—

অবিনাশ কম্পিতপদে ভিতরে ঢুকিল। এখনি হয়ত কোন ফাঁক দিয়া সুধা বাহির হইয়া আসিয়া হৈ চৈ বাধাইয়া দিবে। অবিনাশ প্রতি মুহূর্ত্তে

সুধার আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বাড়ীতে কত অগণিত অপরিচিত শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে—অবিনাশ কাহাকেও চিনিতে পারিল না। নূতন লোক—নূতন মুখ—অথচ উহারা সবাই পুরাতন, অবিনাশই যেন আজ নূতন। অবিনাশকে উহারা জানে না। উহারা জানে না কতদিন এ বাড়ীর কোনও কাজ অবিনাশ না হইলে হইত না। অবিনাশ আগন্তুকের মত চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। হয়ত এখনি সুধা বাহির হইয়া আসিবে। আসিয়া এতদিন দেখা না করার জন্য কত অনুযোগ অভিযোগ করিবে। তারপর দুষ্টু বলিয়া তিরস্কার করিবে। সেই মধুর তিরস্কার লাভের আশায় অবিনাশ চারিদিক বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতে লাগিল। পূজাবাড়ী দালানে একদল ছেলে খেলা করিতেছে। একটি মেয়েকে ঠিক সুধার মত দেখিতে—হয়ত সুধারই মেয়ে।…অবিনাশ কাছে গিয়া ডাকিল—ও খুকি—খুকি শোন—শুনে যাও।

মেয়েটি সুধারই মত দুষ্টু হইয়াছে। অবিনাশের ডাকে এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। একবার অবিনাশের মনে সন্দেহ হইল—সুধা আসিয়াছে তো! নিশ্চয় আসে নাই—আসিলে এতক্ষণ তাহার সহিত দেখা হইত নিশ্চয়!…নিশ্চয় আসে নাই—নিশ্চই! হয়ত কাল আসিবে। সুধার সঙ্গে দেখা না করিয়া অবিনাশ যাইতেছে না। শেষকালে সুধা আসিয়া যে বলিবে—মাষ্টার মশাই সে-ই আসিল—আর একটা দিন থাকিয়া দেখা করিয়া যাইতে পারিল না!

ঘুরিয়া ফিরিয়া অবিনাশ আবার জ্যাঠামশাই-এর কাছে আসিল। বলিল—সুধা এসেছে জ্যাঠামশাই ?…

জ্যাঠামশাই বলিলেন—কবে!…ওপরে আছে দেখা করগে—

অবিনাশ আবার ভিতরে আসিল। কিন্তু উপরে যাইতে তাহার যেন কেমন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। বাড়ীতে কত নূতন বউ আসিয়াছে—পাড়ার কত স্ত্রীলোক আসিয়াছে—হট্ করিয়া 'সুধা' 'সুধা' বলিয়া ডাকিলে—লোকেই বা বলিবে কি! অবিনাশেরও এখন সে বয়স নাই। সুধাও এখন হয়ত কত বড় হইয়াছে। নীচের লোক উপরে উঠিতেছে—উপরের লোক নীচে আসিতেছে—সিঁড়ীর গোড়ায় দাড়াইয়া অবিনাশ যাই কি না যাই করিতে লাগিল। হয়ত একপাল মেয়ের মধ্যে সুধা বসিয়া আছে—সেখানে তাহার হঠাৎ যাওয়াটা কেমন যেন দেখাইবে। আর এখানে আসিবার তো তাহার কোনও ঠিক ছিল না।—কাপড়টাও ময়লা—দাড়ি কামান হয় নাই—জামাটার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নিজের দৈন্য নিজের কাছে আজ প্রথম ধরা পড়িল। কাজ কি উপরে গিয়া!—সুধা হয়ত এখনই নামিবে। তখনই একটু দেখা করিয়া ব্যাস্—সন্ধ্যার গাড়ীতে সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। তবে সুধা ছাড়িলে হয়? হয়ত বলিবে—পূজার ক'দিন থাকিয়া যাও—যে আদুরে মেয়ে—বলিলেই হইল।—তাহার কথা এড়ায় কাহার সাধ্য।…

উপর হইতে জ্যাঠাইমা নাবিতেছিলেন! অবিনাশ পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। জ্যাঠাইমা শুধু বলিলেন—এই যে অবিনাশ কখন এলে—বেশ বেশ, ভাল আছ তো? হঠাৎ অবিনাশ হাতের বাণ্ডিলটি দেখাইয়া বলিল—এইগুলো সুধার জন্যে এনেছিলাম জ্যাঠাইমা—সুধা কোথায় তাকে দেখছিনে তো?

কাপড়ের মোড়কটা জ্যাঠাইমা হাতে করিয়া নিলেন। বলিলেন—দাঁড়াও বাবা—দিচ্ছি তা'কে পাঠিয়ে—বলিয়া তিনি আবার উঠিয়া গেলেন।…

অবিনাশ কম্পিত বক্ষে নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। হৈ হৈ করিতে করিতে সারা বাড়ী কাঁপাইতে কাঁপাইতে সুধা এখনি আসিল বলিয়া! এখনি আসিয়া মাষ্টার মশায়ের দুই হাত ধরিয়া হয়ত উপরে লইয়া যাইবে—তারপর কত কথা।...এতদিন আসেন নাই কেন—সুধার কথা আর মনে পড়ে না বোধ হয়—পূজার সময় অন্ততঃ একবার আসিলে তো হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি —প্রশ্নের উত্তর দিতে অবিনাশ একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িবে।...

অবিনাশ একটি ছেলেকে উপরে পাঠাইয়া দিল সুধাকে খবর দিতে যে তাহার মাষ্টার মশাই আসিয়াছে।—অবিনাশ নীচে হইতে শুনিল—ছেলেটি চীৎকার করিয়া বলিতেছে—ও সুধাদি সুধাদি—তোমার মাষ্টার মশাই এসেছে শোননি—।

সুধার গলার শব্দ আসিল—এসেছে তো কি হ'বে—নাচতে হবে—কতবার শুনবো?—

অবিনাশের সন্দেহ হইল সে হয়ত ভুল শুনিয়াছে।—কিম্বা হয়ত মাষ্টার মশাই বলাতে চিনিতে পারে নাই—নামটা বলিয়া দিলেই হইত!

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—কাহারো আসিবার নাম নাই। অবিনাশের দাঁড়াইয়া থাকিতে কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এত স্ত্রীলোক যাতায়াত করিতেছে, এখানে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের দাড়াইয়া থাকা ভাল দেখায় না। অবিনাশ সরিয়া সেই নিজের পুরাতন ঘরখানির ভিতর আসিল। একবার অবিনাশের মনে হইল—সুধার অসুখ হয় নাই তো। ডাক্তারে হয়ত চলাফেরা বারণ করিয়া দিয়াছে। নিশ্চই তাই! নহিলে খবর পাইয়াছে—মাষ্টার মশাই আসিয়াছে—তবু আসিল না কেন?—

সন্ধ্যাবেলা বাজনা বাজিয়া উঠিল। জাঁকজমকে সারা বাড়ী মুখরিত।

অবিনাশ এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল। মেয়েরা আসা-যাওয়া করিতেছে। একদল ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল—অবিনাশ সেই মেয়েটিকে গিয়া ডাকিল—ও-খুকি—শোন—শুনে যাও—

ছোট মেয়েটি আসিল না। অবিনাশ ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। মেয়েটি পেয়ারা চিবাইতেছিল—উপায় না দেখিয়া সেই চর্ব্বিত পেয়ারা থুথুসমেত অবিনাশের গায়ের উপর নিক্ষেপ করিল।

অবিনাশ কাণ্ড দেখিয়া হতবম্ব হইয়া গিয়াছে: নিকট দিয়া কে একজন বাড়ীর লোক যাইতেছিল—দেখিয়া বেশ করিয়া দু'টি কান তাহার মলিয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন প্রলয় হইয়া গেল—সারা বাড়ী মাতাইয়া মেয়েটি এমন চীৎকার স্বরু করিল—যেন কে তাহার দু'টি কান সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। বাড়ীর যে-যেখানে ছিল—সব সেই উঠানে আসিয়া জড় হইল। জ্যাঠামশাই ছুটিয়া আসিলেন—জ্যাঠাইমা আসিলেন—সকলেরই মুখে এক কথা—কি হয়েছে রে পুঁটু?…পাড়ার লোকের সহানুভূতির প্রবল্যে মনে হইল সত্যই যেন কে তাহার দু'টি কানকে ছিঁড়িয়া লইয়াছে।…

এতক্ষণ পরে পুঁটুর মা খবর পাইয়া উপর হইতে নাবিয়া আসিল। অবিনাশ দেখিল সুধা অনেক মোটা হইয়া গিয়াছে—চেনা যায় না—গলার স্বর বদলাইয়াছে—সারা গায়ে গহনা আর ধরিতেছে না—গর্ব্বে দেহের মেদ যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।—অবিনাশের দিকে চাহিয়াও সুধা যেন চাহিল না।—পুঁটুকে কোলে করিয়া বলিল—অমন আত্মীয়তা কে দেখাতে বলেছিল—পাঁচ টাকার শাড়ী এনে আত্মীয়তা পাতানো—আসতেও কেউ বলেনি—নেমন্তন্নও কেউ করেনি—আমার ছেলে অসভ্য—আমার মেয়ে অভদ্র—কারুর তো খাচ্ছেনা তারা—কারুর বাড়ীও যাচ্ছেনা

—মাষ্টারী ফলাক নিজের বাড়ী গিয়ে—বলিতে বলিতে সুধা আবার উপরে গিয়া উঠিল।

কথাগুলি আসিয়া অবিনাশের গায়ে তীরের মত বিঁধিল। কোথা হইতে কী হইয়া গেল—যেন ভোজবাজি। অবিনাশের মনে হইল—সে যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। আর এক মুহূর্ত্তও তাহার এ বাড়ীতে থাকিতে লজ্জাবোধ হইল।—অবিনাশ নিজের ঘরের কাছে গিয়া দেখিল—দেয়ালের উপর আজো লেখা রহিয়াছে—'মাষ্টার মশাই ভারী দুষ্টু'—অবিনাশের মনে হইল সুধাকে ডাকিয়া আনিয়া ওই লেখাটি দেখায় —কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল—সুধা মরিয়া গিয়াছে—সে সুধা মরিয়া গিয়াছে।—বিবাহ হইবার আগেকার সে সুধা আজ বাঁচিয়া নাই। সবার অজ্ঞাতে অবিনাশ পথে বাহির হইয়া আসিল। এ জীবনে সে আর এ বাড়ী আসবে না।

তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল পূজার সেই শাড়ী আর দুই ছেলেমেয়ের কাপড় সে ওই সুধাকেই দিয়া আসিয়াছে। অবিনাশ জীবনে অনেক আহাম্মুকী করিয়াছে—দু'টাকা দিয়া বিলিতী মোমের পুতুল কিনিয়া পরকে বিলাইয়া দিয়াছে—কিন্তু এমন বোকামি জীবনে সে করে নাই। এখন আর ফিরিয়া চাওয়া যায় না। সত্যবালা পূজার সময় একখানি ধূলি-মলিন কাপড় পরিয়া কাটাইবে—খুকু আসিয়া বলিবে—বাবা কি এনেছ দেখি? —আর এ-বাড়ীতে এই ধনীর প্রাসাদে এ-শাড়ীর হয়ত কোনও মূল্যই নাই! হয়ত কেহ পরিবে—হয়ত পরিবে না। অবিনাশের মাথাটা দুই হাতে টানিয়া ছিঁড়িয়া পিষিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। সুধা মরিয়া গিয়াছে—এ-সুধা—সে-সুধার প্রেতাত্মা।—অবিনাশের মাথার ভিতর সব গোলমাল হইয়া গেল।...

ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের ধার হইতে দূরে নীল কয়েকটা আলো দেখা যায়। এখনই ট্রেন আসিবে। অবিনাশ দুই চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!···তাহার মাথাটা রেলের চাকার তলায় গুড়াইয়া যাক্—পিষিয়া যাক্—তবে শান্তি হইবে। কাল ভোর বেলা এ ট্রেন দেশে গিয়া পৌঁছিবে—বাবলা গাছ—ইউনিয়ন বোর্ডের সাঁকো—তারপর রায়-দীঘি—সত্যবালার সকালেই ঘুম ভাঙে—দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবে—আসিয়া দেখিবে হুলুস্থূল কাণ্ড—টুকু উঠিবে মিনু উঠিবে—উঠিয়া শুনিবে—তাহাদের বাবা রেলে কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে···

অবিনাশ চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

বিষ

অফিসের দেরি হয়ে গেছে, অজয় ঘড়ির দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলো। মার্চেণ্ট অফিস—বড় সাহেব বদ্‌মেজাজী—দেরি হলে হয়রানির অন্ত থাকে না। আজ পাঁচ বছর অজয় চাকরি করছে—হিসেব করলে দেখা যাবে যে নিয়মিত সময়ে অজয় অফিসে হাজির হয়েছে অর্দ্ধেকেরও কম দিন। কিন্তু অজয় ভাবলে—কপাল জোর তাই চাকরি তার টিঁকে আছে, নইলে শোভাকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হোত। পথেই তো তাকে দাঁড়াতে হোত!

শোভা! নামটা মনে পড়তেই অজয় নিঃশব্দে হেসে উঠলো। শোভাই বটে! অজয় সম্পূর্ণ এক গ্লাস জল এক চুমুকে শেষ করলে। হাতে জল দিতে দিতে আবার ভাবলে—শোভাই বটে!

ঠিকে লোক ভাত রেঁধে চলে যায়—যাবার আগে অজয়ের জন্যে একখিলি পানও সেজে রেখে যায়। পানটা মুখে পুরে অজয় জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগলো। কাল রাত্রে অজয়ের ঘুম হয়নি। আজ চার বছর ধরে ভালো করে কোনও দিন ঘুমোতে পেয়েছে একথা অজয়ের মনে পড়লো না। সারারাত শোভার যন্ত্রণা-কাতর গোঙানি অজয়কে এক-দণ্ডের বিশ্রাম দেয় নি। বাড়ীর বাইরে গেলেই অজয় যেন ভালো থাকে। অফিসের ফাইলের খাতায় যেন অজয় মুক্তি খোঁজে।

আত্মীয়হীন, স্বজনবান্ধবহীন অবস্থায় অজয় তৃপ্তি চেয়েছিল বিবাহিত জীবনে। একটি প্রীতিমতী বালিকা হবে তার গৃহলক্ষ্মী, তার সহধর্ম্মিণী —যত্নে সেবায় প্রেমে আত্মদানে যে তার জীবনকে রসায়িত করে তুলবে। আরো বেশী করে চেয়েছিল তৃপ্তি—পরিমিত আকাঙ্ক্ষায় যে করবে

স্বস্তিবাচন—যার কল্যাণস্পর্শে তার স্বল্প-পরিসর জীবন হবে কৃতার্থ—যার—ইত্যাদি ইত্যাদি—অজয় কল্পনা করেছিল অনেক—

ঘরের ভেতর ময়লা কাপড়টা কুঁচিয়ে রেখে অজয় পরিপাটি হ'য়ে দাঁড়ালো।

চার বছর ধরে অফিস যাবার সময় অজয় যেমন করে শোভার কাছে বিদায় নেয় আজও তেমনি করেই নিতে গেল। স্নেহার্দ্র স্বরে বললে—তা'হলে—

অজয়ের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই শোভা বলে—এস—

আজ কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলো।

শোভার গলায় এত শক্তি কোথায় ছিল কে জানে। অজয়ের মনে হোল সে যেন চীৎকার করছে: কাল কত রাত করে এলে—জানো আমার ভারী ভয় করছিল—আজ একটু সকাল সকাল—

শোভার স্বর মিনতিবাচক। কিন্তু অজয়ের মনে হোল এ সুর যেন অক্ষমের বিদ্রোহের সুর।

অজয় বললে—সাধ করে কি আর বাড়ী আসি না—অফিসের কাজ তো আর বউ-এর অসুখ শুনবে না—

শোভা শুনলে—মৃদুস্বরে শুধু বললে—না, তাই কি বলেছি আমি—

হঠাৎ আবার ঘড়ির দিকে চাইতেই অজয় লাফিয়ে উঠলো। আর দাঁড়ানো যায় না। ঘরের চারদিক দেখে নিয়ে অজয় বেরিয়ে আসছিল—হঠাৎ—

আলমারির ভেতর ছোট লাল ওষুধের শিশিটা যেন অকস্মাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। অজয় শোভার দিকে মুখ ফেরালে। নিরাভ কঠিন জীবন

—শুধু কঙ্কাল—চার বছরের রোগশয্যা আজ রোগিণীকে মুখব্যাদন করে ব্যঙ্গ করছে। অজয়ের অফুরন্ত যৌবন—অজয়ের দৃষ্টির সাম্‌নে সবুজ স্বপ্ন আর লাল কামনা। বাঁচবার দুর্দ্দম স্পৃহা অজয়ের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হ'য়ে গেল। নিরুপদ্রব জীবনে একি অনাবশ্যক অশান্তি। অজয়ের দুই পায়ে ভর দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হোল। সোজা হ'য়ে সে দাড়াবে—দৃড়কণ্ঠে সে ঘোষণা করবে যে সে-ও সচল, সে-ও সুখী, সে-ও মানুষ—বিবাহ করে সে বিড়ম্বিত হ'তে আসেনি। যা বাহুল্য কিম্বা যা অনাবশ্যক তা' সে সর্ব্বান্তঃকরণে ত্যাগ করবে। না, তার কর্ত্তব্যবোধ নেই—সহানুভূতি নেই—স্নেহলেশহীন আত্মসুখসর্ব্বস্ব যুবক সে। বিবাহ করেছে বলে সে পাগল নয়। সে স্বার্থপর—আত্মপরায়ণ—বস্তুতান্ত্রিক। আইনানুযায়ী সে নিজের সুখ-পথের বিঘ্নকে অপসারণ করবে—অজয় নির্নিমেষ চোখে শিশির ভেতরের লাল রঙের তরল পদার্থটা লক্ষ্য করলে—। চক্ষের পলকে ঘর, বাড়ী, দেয়াল, চেয়ার টেবিল, আকাশ, পৃথিবী—সমস্ত রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। অজয়ের মনে হোল : তার অতৃপ্ত-কামনা আজ সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে ; অজয় চোখ বুজলে।

শোভা এবার কথা বললে—না, অফিস তোমায় কামাই করতে হবে না—আজকে ভালই তো আছি—

আজ অজয়ের কী হোল কে জানে! চাকরি যদি যায় তাতেও তার আপসোস করবার কিছু থাকবে না। চাকরি হয়ত আবার আসবে কিন্তু এই মুহূর্ত্ত ?

মৃদু সহানুভূতিতে ভরিয়ে দিয়ে অজয় বললে—তোমার তো মাথা ধরে বলছিলে না ?

শোভা যেন অনেক দিন পরে কৃতার্থ হ'য়ে উঠলো—আর সবই তো গেছে এই মাথা ধরাই এখন রয়েছে কেবল—

অজয় শিশির ওপর 'poison' লেখা লেবেলটা নখের আঁচড়ে তুলে ফেললে—

শোভা বলে উঠলো—ওগো দেখ—এই দিকে চেয়ে দেখ—এই হাতটা একটু মোটা হয়েছে না? ও-বাড়ীর বুলীর-মা কি বলছিলো জানো—

অজয় সমস্ত শক্তি দিয়ে মনে মনে বললে—আমার কোনও অপরাধ নেই ঈশ্বর—আমি নিষ্পাপ—আমার কোনও অপরাধ নেই—আমি শুধু নিজের মুক্তির পথ পরিষ্কার করছি।—আমাকে মার্জ্জনা কোরো—

শোভা আনন্দে গলে গেছে। বলে—আর দেখ, অনেকদিন পরে সেন বউদি এসেছিল—তা' দেখ নতুন এক সেট্ বুঝি গয়না করেছে—তা-ই বার বার হাত ঘুরিযে ঘুরিয়ে—ওমা অফিস যাবে না আজ—ক'টা বাজলো হুঁস আছে?

তাই তো! অজয়ের যেন এতক্ষণে হুঁস হোল!

—এই নাও—বাড়ীতেই তো রয়েছে মাথাধরার ওষুধ, আমার অসুখের সময় আনা হয়েছিল—মনে পড়লো তাই! তা' ঘণ্টাখানেক পরেই খেয়ে নিও—সবটাই খেও—কতটুকুই বা—আজ রাত্তিরে তা'হলে ঘুমের জন্যে আর—রইল এখানে—আসি আমি—কি বল—

শোভা যাতে হাত বাড়িয়ে নিতে পারে তাই মাথার কাছেই অজয় শিশিটা রেখে দিয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে অজয় যন্ত্রচালিতের মত ছুটে চলতে চায়। মনে হয়—পেছনে যেন কার আর্ত্তনাদ শোনা যাবে। অজয় চারিদিকে চাইলে। রাস্তার লোক তার মুখ দেখে কি টের পেলে?

চার বছরের সমস্ত যন্ত্রণার আজ পূর্ণচ্ছেদ। অজয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত—নিশ্চয়, শোভার উচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সমস্তদিন রাত্রির পরিবর্ত্তনের মাঝে মূর্ত্তিমতী অব্যয়ের মত শোভার সেই একঘেয়ে দিনাতিপাত। চারটি বৎসরের ক্লান্তিতে অজয়ের তিরিশটি বৎসরের জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। অজয় ত্বরিত ক্ষিপ্রতায় বাসে লাফিয়ে উঠলো—শোভার মৃত্যু-কাতর আর্ত্তনাদ যদি এখান থেকে শুনতে পাওয়া যায়—যদি—যদি—

আর ঘণ্টাখানেক। তারপর অসহ্য মাথাধরার উপশম হবে সেই ওষুধে। তরল পদার্থটি কণ্ঠে ঢালতেই সমস্ত শরীর হয়ত রি রি ক'রে উঠবে। তারপর সে কী যন্ত্রণা—শোভার চীৎকারে প্রতিবেশিনীদের উৎকণ্ঠা। তারপর হয়ত কঠিন শীতল নিস্পন্দ মৃত্যু! শোভা হয়ত মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তা'কে দেখতে চাইবে—বাড়ীর ঝি তখন তস্ত্রস্ত হ'য়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। কে তাকে খবর দেবে। দয়া ক'রে যদি কোনও প্রতিবেশী তাকে অফিসে ফোন্ করে! শোভার মৃত্যু-কাতর মুখখানাকে ভাবতে অজয়ের মুখখানাও ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

অজয়ের মনে হোল—শোভার ঘরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য সে দেখছে: বিষের জ্বালায় গলা তার নীল হয়ে এসেছে। কথা বন্ধ হোল—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েছে—ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে—জল দাও, ওগো জল দাও—। কান্নায় বাতাস ভারী হোলো—যেন তার প্রেতাত্মা আজ অজয়ের পেছু নিয়েছে—জল দাও, ওগো জল দাও; বিষের জ্বালায় তা'র পাকস্থলী পুড়ে গেল! তার কান্নার শব্দে শহরের সমস্ত শব্দ থেমে গেল। সে কাঁদছে—অজয়ের মনে হোল—সেই কান্না তার সারা জীবনে আর শেষ হবে না।

দিনের পর দিন

বাস-কণ্ডাক্টার টিকিট চাইলে।

অজয় পকেট থেকে পয়সা বের করে বললে—বিষ —

বিষ বলেই অজয় সামলে নিয়েছে : না না ডালহৌসি একঠো।

কী অভাবনীয় কাণ্ড! আশেপাশে কয়েকজন লোক তার দিকে চাইলে। বিষের কথায় আরেক দিনের এক ঘটনা অজয়ের মনে পড়লো। সকালবেলা অজয় খবরের কাগজ পড়ছে। হঠাৎ একটা বিষ খেয়ে আত্ম-হত্যার বিবরণে অজয় আকৃষ্ট হোল। প্রেমের ব্যথায় দুই তরুণ-তরুণীর আত্মহত্যা—কিন্তু শোভাকে খবরটা দিতেই শোভা শিউরে উঠেছিল। বলেছিল—সত্যি কী করে যে বিষ খায় কে জানে—শুনলেই তো আমার বুক কেঁপে ওঠে—

বাঁচতে শোভার বড সাধ! বড় সাধ সংসার করবার। বড় সাধ স্বামী-সেবা করবার। কিন্তু বিয়ের পর থেকে সেই যে শয্যা গ্রহণ করেছে—মৃত্যু না হ'লে হয়ত আর সে ত্যাগ করবে না। এই চারটি বছর প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে অজয় প্রার্থনা করেছে—যেন বাড়ী ফিরে সেই দৃশ্য না দেখে—যেন দেখে সুস্থ হয়েছে শোভা—শয্যা থেকে উঠে বসে শোভা যেন তাকে অভ্যর্থনা করে। প্রতিদিনকার স্বপ্ন প্রতিদিন ভেঙে গেছে। অজয়ের কি দোষ। তার যৌবনের চারটি বছর অপচয় করবার কী অধিকার ছিল শোভার। তাকে ঋণ-জালে জড়িত করে পলে পলে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়াতে কী তার লাভ! একটা দিন নয়—দুটো দিন নয়—চারটি বছর, চার বছরের মৃত্মন্থর পদক্ষেপ অজয়ের যৌবনকে নিঃশেষিত নিষ্পেষিত করে চলে গেছে। অজয়ের সে ইতিহাস বড় মর্ম্মন্তুদ।

কী রোগ কে জানে! ওষুধে ডাক্তারে একশেষ হয়ে গেছে। জ্বর হয়—

কিছুদিন থাকে আবার—কিছুদিন থাকে না—কিন্তু দিনের পর দিন শরীরকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন করে দিয়ে তবে চলে যায়। একদিন অজয়ের আশা ছিল: শোভা ভাল হবে—ভাল হয়ে সংসার করবে; আর পাঁচটি গৃহের মত তার গৃহও আনন্দমুখর হয়ে উঠবে—কিন্তু ভাল হবার আশা আর নেই। অজয় আজ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশাবাদী!

অফিসে নিজের চেয়ারে বসে অজয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো!

যা হয় হবে—ফাইলের মধ্যে অজয় নিজেকে ডুবিয়ে দিলে। ছোটবেলার একটা কাহিনী অজয়ের মনে পড়লো—

পড়ার ঘরে টিপি টিপি পায় যে এসে তাকে প্রায়ই চম্‌কে দিত সে হচ্ছে খুকী—ডাক নাম তার খুকী—পাশের বাড়ীর মেয়ে। তখন পরীক্ষা—মনোযোগ দিয়ে অজয় পড়ছে—একবার পেছন ফিরে দেখলে খুকী এসেছে—ছোট কাবলী বেড়ালটা কোলে ক'রে। খেলবার উদ্দেশ্য নিয়ে খুকী এসেছিল কিন্তু অজয় তাকে প্রশ্রয় দিলে না—যেমন পড়ছিল তেমনি পড়তে লাগলো। খানিকপরে ফিরে দেখে খুকী চলে গেছে—দেয়ালের ওপর খড়ি দিয়ে লিখে রেখে গেছে—'ছোড়দা'কে আমার ভারী ভয় করে'।

অজয় খুব একচোট হেসেছিল। পরের দিন কলেজ থেকে ফেরার পরে অজয় খুকীর কাবলী বেড়ালের জন্যে চমৎকার একটি ঘুমুর-লাগানো বগলোস কিনে এনেছে। খুকীকে দিতেই আনন্দে সে নেচে উঠেছে। রাত্রে শুতে যাবার সময় অজয় দেখলে দেয়ালের সেই জায়গাটায় কে আবার লিখে গেছে—'ছোড়দা'কে আমার ভারী ভালো লাগে'—

তারপর সেই খুকী বড় হোল।

বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। লোকজন হয়ত খুকীকে দেখতে এসেছে—হঠাৎ খুকীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজি হোল বিস্তর—কোথাও নেই—শেষে দেখা গেল—অজয়ের বিছানায় লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে আছে—লেপটা তুলতেই—কী কান্না মেয়ের। বিয়ের আগের দিন অজয় খুকীকে কী একটা কথা বলতে গিয়েছিল—কিন্তু খুকী মুখ গোঁজ করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল।

তারপর বিয়ের পরে একদিন ··

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো পাশের ঘরে। হয়ত অজয়কেই ডাকছে। এতক্ষণ তা'হলে ওষুধের ক্রিয়া সুরু হয়েছে। অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল। যন্ত্রণায় ওদিকে এতক্ষণ শোভা চীৎকার করছে। এতদূর থেকেও যেন অজয় সে চীৎকার শুনতে পেলে। কিন্তু না, তাকে কেউ ডাকছে না—অজয় নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার চেয়ারে বসলো।

অজয়ের পাশের চেয়ারে বসে ভবতোষ। ছোট-খাট বেঁটে কমবয়েসী ছেলে ভবতোষ। অজয় তার দিকে চাইলে—হাতে কলম, সামনে ফাইল খোলা কিন্তু চোখ তার উদাস। অজয় নিজের কাজে মনোনিবেশ করলে—কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে চাইল ঃ ভবতোষ তেমনি উদাস।

—ঘোষ।

অজয় এবার ফিরে চাইলে—ভবতোষ ডাকছে।

—ভাবছি ছুটি নেব হে—কালকে নিয়েছি, আজকে নিলে বড়বাবু ক্ষেপে যাবে না তো ?

অজয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসলো—কী ব্যাপার বল তো হে—

ভবতোষ নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এল।

—চল না একটু ওদিকে, ভারী বিপদে পড়েছি—গলা জড়িয়ে এল ভবতোষের। হলের এককোণে নিরিবিলিতে এসে ভবতোষের কী যে হোল—সে প্রায় কেঁদে ফেললে।

—সুলতা বোধ হয় আর টিকিবে না ভাই, কাল তো শেষ চেষ্টা করে দেখেছি—ডাক্তার বলে—আশা আছে বটে কিন্তু—

আবোল-তাবোল অনেক কিছুই বললে ভবতোষ—অজয় ভাবতে লাগলো: সুলতা কেন মরবে—সুলতা বাঁচুক—শোভার অবশিষ্ট আয়ু দিয়েও যদি সুলতাকে বাঁচানো যেতো! যে অনাবশ্যক তার জন্যে বিধাতার এত দরদ ;—সুলতার জীবন ভবতোষের পক্ষে অনিবার্য্য—সুলতা ভবতোষের জীবনে তৃপ্তি দেবে, শান্তি দেবে—আর শোভা?

অজয় আবার চেয়ারে এসে বসলো।

অফিসের কোলাহল, বাইরের রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দ অজয়ের মস্তিষ্কের তন্ত্রীতে আঘাত করতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে হোল: চারিদিক অন্ধকার করে এসেছে। এত শীগ্‌গির সন্ধ্যা এল। ডালহৌসির কর্ম্মব্যস্ত আবহাওয়ায় যেন মন্থরতা নেমে এসেছে। অজয় উঠলো।

সেই বাড়ী—শহরতলীর ছোট ভাঙা বাড়ী—বাড়ীর দেয়ালে আবরু নেই। রাস্তায় গ্যাস জ্বেলে দিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা এখন যে-যার বাড়ী ফিরে গেছে। অফিস ফেরত কেরাণীর দল দ্রুত পদে বাড়ী ফিরে চলেছে। অজয় যেন ঘুমন্ত দেহ নিয়ে হেঁটে চলেছে। বাড়ীর দরজা খোলা। স্যাঁতস্তেতে কলতলার কাছে অন্ধকার ঘন হ'য়ে এসেছে। অজয় কান পেতে রইল। হঠাৎ দুম্ দুম্ করে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। শোভা না? অজয় চমকে উঠলো। সুন্দর স্বাস্থ্য—চুল বেঁধে,

সিঁদুর পরে, শাড়ী বদলে—এ যেন আর কেউ। চার বছরের রোগশয্যা-শায়িতা শোভা তো এ নয়। বিবাহের আগে অজয়ের কল্পিতা মানসী। অজয় দু'চোখ আঙুল দিয়ে ভালো করে মুছলে। ভুল তার হয় নি—ভুল হবার কথা নয়।

অজয়কে শোভা দেখতে পায়নি। অজয় ডাকলে—শোভা! তাড়াতাড়ি ঘোমটা দিয়ে শোভা বিস্ময়ে আনন্দে ফেটে পড়লো—ওমা তুমি, কখন এলে; জানো ও-বাড়ীর পিসীমা কি এক ওষুধ দিয়েছিল—টোট্‌কা ওষুধ—তাই খেয়েই—

অজয় নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সেই ছোটবেলাকার খুকী, সেই ভবতোষের মুমূর্ষু স্থূলতা, আত্মীয়া অনাত্মীয়া সকলের ওপর আজ যেন বাহাদুরী নিতে পারে তার শোভা।

শোভা বলে উঠলো—ওমা দাঁড়িয়ে রইল দেখ, কী হোল তোমার—তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না, আচ্ছা কী করলে বিশ্বাস হবে বল তো—

বিশ্বাস! বিশ্বাস আগে হোত, এখন আর হয় না। অজয়ের কৈশোর যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন একে একে যখন ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে—তখন বিশ্বাস কিসে হবে? জীবনে শান্তি নেই—চোখে ঔজ্জ্বল্য নেই, ঋণের দায়ে অজয়ের স্বাস্থ্য আজ ক্ষয়িষ্ণু—বাস্তবকে স্বপ্ন বলে তার ভুল হবে বৈকি।

—ওকি ছাড়, ছাড—অজয়কে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে শোভা তার ঠোঁট এনেছিল—হয়েছে, হয়েছে গো, বিশ্বাস হয়েছে—

সেই স্যাঁতসেতে কলতলায় দাঁড়িয়ে অজয় ভাবলে: হোক স্বপ্ন তবু তো দু'দণ্ডের শান্তি! শোভা সুস্থ হয়েছে তা কল্পনা করেও আনন্দ।

শোভা সুন্দরী—শোভা যুবতী এ চিন্তাও সুখপ্রদ। শোভা সুস্থ হ'য়ে তার সংসার করছে—তার সহধর্ম্মিণী হয়ে—

হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে হাত রাখলে—

—আরে ঘোষ যে—এদিকে কোথায়—

তাদের অফিসের ননীলাল। অজয় মর্ত্যজগতে ফিরে এল। এ-কোথায় এসেছে সে। রাত হয়েছে। কলেজ ষ্ট্রীট! কোথায় ডালহৌসি থেকে এতদুর এসেছে হেঁটে! এতক্ষণ বুঝি সে স্বপ্ন দেখেছে। কখন অফিসের ছুটি হয়েছে তাও মনে নেই।

ননীলাল বললে—বাড়ী তো কালীঘাটে—এদিকে যে—

—এই ভাই, কাজ ছিল একটা—তুমি?

ননীলাল পাশের দোকানের শো-কেস দেখিয়ে বললে—কাপড়টা পছন্দ হয়?

—কাপড় কোথায়—ওতো শাড়ী—

—ওই হোল—বিয়ে করে এস্তোক্ নিজের সখ আর নেই—এখন কেবল শাড়ীর ভাল ভাল পাড় খুঁজে বেড়াই—

—কার জন্যে?

ননীলাল হো হো করে হেসে উঠলো—তোমাকে নিয়ে আর···প্রথম পক্ষ যাবার পর এবার ভাই একেবারে যাকে বলে ইয়ে—মানে—ননীলাল কী বলবে ভেবে পেলে না।

ননীলালের হাত থেকে কোনও রকমে ছাড়া পেয়ে অজয় বাড়ী যাবার জন্যে ট্রামে উঠলো। জনতা-বহুল ট্রাম। অজয় এককোণে জায়গা করে নিলে। এরা সবাই সুখী। এই ননীলালের দল। অজয়ের মনে হোল: বাড়ীতে এতক্ষণ হৈ চৈ পড়ে গেছে নিশ্চয়ই; প্রতিবেশীদের ভিড়ে তার

বাড়ী কল-মুখর। হয়ত ডাক্তারকেও খবর দেওয়া হয়েছে। অজয়ের মাথার ভেতর চিন্তাগুলো পোকার মত কিলবিল করছে। কী হবে তা হ'লে—কী হবে তারপর ?

তারপরেই মনে হোল—যদি কেউ জানতে পারে! যদি শোভা কাউকে বলে গিয়ে থাকে। অজয়ের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত শির্ শির্ করে উঠলো। পর পর অনেকগুলো ভয়াবহ দৃশ্য কল্পনা করে অজয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

মানুষ এক মুহূর্ত্তেই মরে না। মরবার আগে মৃত্যুযন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে ঘরের ভেতর যখন সে ছট্‌ফট্ করছে তখন···তখন একফোঁটা জল খেতে চাইবে হয়ত। খানিক পরেই মুখ দিয়ে বেরোবে ফেনা—সাদা সাদা থুথুর ফেনা—চোখ হবে দৃষ্টিহীন—হাতটা এলিয়ে পড়বে ঝুলে—কয়েকবার অল্প জ্ঞান হবে—একটু চাইবে চোখ তুলে—তারপর আর জ্ঞান হবে না, আর চোখ তুলে চাইবে না—নিস্পন্দ···নিথর···স্থির···

সেই মুমূর্ষু শোভাকে কল্পনা করতেই নিজের নিষ্ঠুরতায় অজয় নিজেই চমকে উঠলো। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—সেটা খায়নি শোভা! যদি না খেয়ে থাকে তবেই যেন ভাল হয়—তবেই যেন অজয় স্বস্তি পায়। কিন্তু এখনও তো সময় আছে—বাড়ী পৌঁছুতে অজয়ের এখনও প্রায় এক ঘণ্টা। এর মধ্যে যদি···

অজয় সেই দণ্ডেই ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। তারপর কী যে হোল—হাত বাড়িয়ে একটা ট্যাক্সিকে ডাকলে। ট্যাক্সি যখন ছুটছে তখনও অজয়ের মনে হোল—কেন আরো জোরে যাওয়া যায় না ?

অজয় একান্ত মনে প্রার্থনা করে—বিষ যেন শোভা না খায়। চিররুগ্না হোক্—স্বাস্থ্যহীনা হোক্—তার জীবন বিড়ম্বনা—তবু তো স্ত্রী! তার

উপর অজয়ের এই অহেতুক মায়া অকস্মাৎ কেন যে হোল—কে জানে। মনে হোল—যদি সমস্ত পৃথিবীর পরিবর্ত্তেও তাকে বাঁচানো যেতো! যদি তার নিজের জীবনের বিনিময়েও তাকে বাঁচানো যেতো! শোভা তাকে চার বছরের মধ্যে এক দণ্ডের জন্যে কোনদিন শান্তি দেয়নি—সে কী করবে! কী করবে শোভা! শোভা কি তাকে কম ভালবাসে! তার অফিস যাওয়ার পর সারা পৃথিবীতে যদি কেউ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে অপেক্ষা ক'রে থাকে, তবে সে তো ওই শোভা! শোভার বড় সাধ বাঁচবার—বড় সাধ সংসার করবার—বড় সাধ স্বামী-সেবা করবার—

শোভার সেই কথাটা অজয়ের মনে বিদ্যুতের মত চমকে উঠলো—কি ক'রে যে লোকে বিষ খায়—শুনলে আমার বুক কেঁপে ওঠে কিন্তু—

হু হু করে ট্যাক্সি ছুটছে। অজয়ের পৃথিবীতে এখন ভীষণ ঝড়—সেই ঝড়ে আকাশ-বাতাস—চৌরঙ্গী-এস্‌প্ল্যানেড্—সব ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল। অজয় ভাবছে—শহরতলীর এক বাড়ীতে একটি প্রাণী যে মুমূর্ষু সে-খবর এরা কেউ রাখে না। যে খুনী সে যে শহরের বুকের ওপর দিয়ে ট্যাক্সি চড়ে চলেছে—সে-খবর এরা কেউ জানে না!

ট্যাক্সি গলির ভেতর ঢুকলো।

বাড়ীর সামনে যে ভিড়ের আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা নেই। তবে হয়ত এখনও সবাই খবর পায়নি। অজয় ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল। আশ্চর্য্য হোল অজয় এই দেখে যে সদর দরজা বন্ধ! তবে কি ডাক্তারকে ডাকা হয়নি? বাড়ীতে যে ঝি-টা আছে সে-ও কি টের পায়নি নাকি! অজয় সদর দরজায় ধাক্কা দিলে।

দরজা খুলে দিলে ঝি।

ঝির মুখ দেখে অজয় বোঝবার চেষ্টা করলে—শোভা কেমন আছে। অন্ধকারে ভালো করে তার মুখ দেখা যায় না। জিজ্ঞেস করলে—তোর মা কেমন আছে?

ঝি বললে—তেমনি ধারাই আছেন—যেমন রোজকার…

অজয় বিস্মিত হ'য়ে গেল। ভাল আছে! যেন ভালই থাকে—যেন ভালই থাকে সে! সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম করে গিয়ে উপরে উঠলো অজয়। ঘরের আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। না, নিঃশব্দ ঘর! ঘরে ঢুকে কি দেখবে কে জানে!

ভেতর থেকে শোভা যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল; বললে—কে?

অজয় ঘরে ঢুকলো।—লাল তরল পদার্থ-ভরা শিশিটা সেখানে নেই—সেটা কোথায় গেল? সেটা কে সরালে! যে-ই সরাক—সে আজ অজয়ের পরম উপকার করেছে।

—তুমি—শোভা দুর্ব্বল হাতে মাথায় ঘোমটা দেবার চেষ্টা করলে!

—কেমন আছ? অজয় জিগ্যেস করলে।

—আজ তুমি খুব শীগ্‌গির এসেছ কিন্তু, হ্যাঁ গো, অফিস থেকে পালিয়ে এলে বুঝি? দেখ তো আমার জন্যে তোমার…কত কষ্ট…

গলা ভারী হয়ে এল শোভার। বললে—ওগো শোন, ভুল করে তুমি মাথাধরার কী ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলে?…ভাগ্যিস কমলদা'র বউ এসেছিল—বললে—এ যে টিঞ্চার আইডিন—আমি বললাম—মানুষটার কি মাথার ঠিক আছে—কী ওষুধ দিতে কী দিয়ে গেছে। তা' ভাগ্যিস খাই নি—।

তারপর গলা আরো ভারী হ'য়ে এল—আমার জন্যে তোমার যদি. দু'দণ্ডের শান্তি থাকে ! তোমার শরীর যে দিন দিন কী হচ্ছে সে আমিই ···আমার যেমন···মরণও হয় না—

তারপর সত্যিই শোভা কেঁদে ফেললে। সেই চিরাচরিত কান্না ! উঃ, অসহ্য—সেই রুগ্না স্ত্রী, ঘরে সেই চার বছরের স্যাঁতসেঁতে আব-হাওয়া, সেই···সেই···অজয়ের মন তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। ঋণের দায়ে তাকে আবার জড়াতে হবে—আবাব চলবে প্রাত্যহিকতাব পুনরাবৃত্তি —আবার ওষুধে ডাক্তারে একশেষ হওয়া—আবার একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনাতিপাত—অজয়ের মন বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো।—শান্তি কি তার জীবনে কোনদিন আসতে নেই ! কেন, কে কমলদাদার বউ—কী তার আসবার প্রয়োজন ছিল ! কেন সে বললে—ওটা টিঞ্চার আইডিন্। কী শত্রুতা করেছিল তার অজয় ? না শোভা মরলেই ভাল হোত—মঙ্গল হোত। অজয় একান্তভাবে প্রার্থনা কবলে—হে ঈশ্বর—মৃত্যু কি নেই শোভার ! ওকে মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও ওকে—আমি ওর শুভাকাঙ্ক্ষী—আমি ওর প্রকৃত মঙ্গলকামী—ওকে মুক্তি দাও তুমি !

শত্রু আসছে আবার

এই বাড়ীতেই সুবালার চার বছর কেটে গেল। চারটি বছরের অভ্যস্ত অসঙ্কোচ গতি সুবালাকে এতটুকু পীড়িত করতে পারেনি। দৈনন্দিন নিয়মানুসারে পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উঠেছে—পশ্চিম দিকে সূর্য্য অস্ত গেছে। এ-পাড়ার প্রত্যেকটি প্রকাশ্য জিনিষের সঙ্গে সুবালার পরিচয় আছে। অনেক দূরে মিত্তিরদের ভাঙ্গা-বাড়ীর ছাদের ওপরে একটা অশ্বথ গাছ আছে—সুবালা দেখে আসছে, প্রত্যেক বছর নিয়মিতভাবে ও-গাছটি গ্রীষ্মকালে সমস্ত পাতা খসিয়ে ন্যাড়া হ'য়ে যায়—আবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি থেকে কচি কচি পাঁতায় গাছটার আগাগোড়া ঢেকে যায়! তার ও-পাশের কাদের বাড়ীর বারান্দায় কালো ছেঁড়া চটের পর্দ্দা ঝুলছে—বহুকাল থেকে ঝুলছে—বর্ষা গ্রীষ্ম আর শীত কখনও পর্দ্দাটা একটু ওঠেনা—ও-পর্দ্দার আড়ালে কি আছে কে জানে! ভোর না হ'তে হ'তে এ-পাড়ায় আশপাশের বাড়ী থেকে কলরব সুরু হয়—সারা পাড়ায় প্রাণের নাড়ীতে তখন সে স্পন্দন দ্রুততর হ'য়ে ওঠে। সবাই এ-পাড়ার কেরাণীজীবী। সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই আবার সব নিঝুম। নিস্তরঙ্গ নদীর মত এ-পাড়ার আবহাওয়া তখন মন্থর। গলির ভেতর দিয়ে কোনও পথিক হেঁটে গেলে, তার চলার শব্দ সুবালা রান্নাঘরে বসেও শুনতে পায়। দূর থেকে চিলের অদ্ভুত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসে। সেই অলস অবসরে যখন সব বাড়ীর গৃহিণীরাই পাখা হাতে নিয়ে মেঝের ওপর একটু গড়িয়ে নেয়—তখন হয়তো আসে বাসন-ওয়ালীরা। ছেঁড়া পুরনো কাপড়ের বদলে তারা

দিয়ে যায় নতুন কাঁসার বাসন—গেলাস—ঘটি—পদ্মকাটা কাঁসি, বগী-থালা কত কি! বাড়ীর সুগৃহিণীরা দর কষাকষি করে তাদের সঙ্গে সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে দেয়—কেউ কেনে—কেউ কেনে না! তারপর বিকেল, কলের জল আসতে আসতে এঁটো বাসনগুলো মেজে ফেলতে হয়—কুঁজোয় জল ধরে রাখতে হয়—উনুনে আগুন দিয়ে তখন টপ্ করে কলতলায় বসে আরাম করে গা-খুলে দিয়ে সারা গায়ে জল ঢেলে দিতে হয়! কী আরাম,—কী শান্তি তখন! হয়ত ওদিকে তখন উনুন ধরে গেছে—তাড়াতাড়ি সন্ধ্যেটা দেখিয়ে রান্না ঘরে ঢুকতে হবে! আর, অত তাড়াতাড়ি না করলে কি চলে? এখুনি অফিস থেকে কর্ত্তারা ফিরবেন রক্তমূর্ত্তি হ'য়ে—ছেলেরা ফিরবে খেলার মাঠ থেকে—সারা বাড়ীতে সন্ধ্যে পেরোতে না পেরোতে খাই খাই! এ-পাড়ার বাড়ীতে এই স্পন্দন সুবালা বহুদিন থেকে দেখে আসছে—এই এমনি করেই এ-বাড়ীতে সুবালার চার বছর কেটে গেল।

পাড়াটা ছোট—বাড়ীগুলো ছোট—ছোট মানুষ এরা সব। তবু এ-বাড়ী ও-বাড়ী সৌহার্দ্দ্য আছে। দুপুর বেলা যখন গলিটা নির্জ্জন—মেয়েদের কাজ মিটে গেছে—তখন এ-বাড়ীর লোক ও-বাড়ী বেড়াতে যায়। ছোট ছোট মেয়েরা—যাদের বয়স বাড়ার দরুন ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে—তারা দল বেঁধে এক জনের বাড়ীতে বসে হয় সেলাই করে, নয় সেলাই করার নাম করে মুখরোচক গল্প করে। নতুন বউদের কেউ কেউ লেখাপড়া জানে—লাইব্রেরী থেকে তাদের জন্যে বাঙলা বই আসে—দুপুরটা তাদের কাটে ঘুমিয়ে, বইটা শুধু ঘুমের এক রকম ওষুধ! কোনও বয়স্কা মহিলা বেড়াতে এলেন এ-বাড়ীতে—হ্যাঁ-গা বৌমা, ও-পাড়ার স্যান্-বউএর কিত্তি শুনেছ?

সুবালা হয়ত তখন সবে খেয়ে উঠেছে—তাড়াতাড়ি বসবার জায়গা করে দিয়ে বলে—কই, কিছু শুনিনি তো মাসীমা—

বয়স্কা মহিলাটি তখন আয়েস করে বসেন—কৌতূহলটা অধিক মাত্রায় বাড়িয়ে দেবার আশায় বলেন—শোননি তো শুনে কাজ নেই বাছা—সে শুনলে পাপ হয়—সত্ত সত্ত পাপ—

এক একদিন কেউই আসে না। সুবালা একা একা বসে অনেক কথা ভাবে। বিয়ের কথা, বিয়ের আগের কথা! ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে; হঠাৎ হয়ত কার ডাকে ঘুম ভেঙে যায়—বৌমা, কী করছো গো?—

—আসুন জ্যাঠাইমা, বলে সুবালা দরজা খুলে দেয়।

জ্যাঠাইমা কোন ভূমিকা না করেই বলেন, এই বোলতে এলাম, বলি তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে আমাদের ন্যাপার—এই আমার দেওর-পো ন্যাপার চাকরি হ'য়ে গেল পঞ্চাশ টাকা মাইনে—মন্দ কি-গা—বউ নেই বেটা নেই—কী বল বাছা—তা' হোল যেন, হোল এই তোমাদের পাঁচ জনেরই—

তা' বলে পঞ্চাশ টাকার কথা সত্যি নয়—তা' সুবালা জানে! এ পাড়ার লোক অমন বলে থাকে; তিরিশকে পঞ্চাশ করা এ-পাড়ার লোকের অভ্যাস। এ সুবালা ভাল করেই জানে! জানতে আর সুবালার কিছু বাকি নেই; অভ্যস্ত আবহাওয়া, পরিচিত পরিবেষ্টনী! উদয়াস্ত দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। রাস্তা দিয়ে কখন কোন ফেরিওয়ালাটা যায় কোন বাড়ীতে শাশুড়ী-বউতে বনে না, কোন বাড়ীর বউ-এর কী কেলেঙ্কারী সব, সব! জানবে বা না কেন? চার বছর ধরে সুবালা এ-পাড়ায় রয়েছে, এই বাড়ীতেই সুবালার চার বছর কেটে গেল যে!

তা' গুপীনাথ লোক ভাল। মাসকাবারি মাইনেটা এনে সুবালার হাতে দিয়ে দেয়। অফিস যাবার সময় সুবালা তা'র হাতে বারোটা করে পয়সা রুমালে বেঁধে দেয়; দশ পয়সা বাস ভাড়া—দু'পয়সা জলখাবার! দু'পয়সার চানাভাজা খেলেই গুপীনাথের চ'লে যায়। এক একদিন সুবালার জন্যেও পকেটে করে আনে; রান্নাঘরের ভেতর ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে সুবালা হয়ত আপাদমস্তক ঘেমে উঠেছে, শাড়ী আর সেমিজের সুবিন্যাস নেই, সেই অবস্থায় গুপীনাথ সরাসরি রান্নাঘরের মধ্যে এসে হাজির; পায়ে জুতো, গায়ে জামা, হাতে আফিসের ফাইল সেই অবস্থায়, ভাবো একবার—

সুবালাকে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠতে হয়; নইলে গুপীনাথ কী কাণ্ড করে বসে কে জানে! হয়ত সেই ঘামসুদ্ধ সেই অফিস ফেরতা অবস্থায়, বলা তো যায় না—

গুপীনাথ ঝুঁকে প'ড়ে বলে কী রাঁধছো দেখি,—

সুবালা অস্থির হয়ে রেগে ওঠে। বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, বেরোও বেরোও জুতে পরে সমস্ত একাকার! দেখলে যত সব অনাছিষ্টি, ওমা কোথায় যাবো, কিছুতেই দেবো না, না না—

সুবালা পালিয়ে আসে। গুপীনাথ এক একদিন আফিস থেকে আসতে দেরি করে। গুপীনাথের খেলা দেখা বা বায়োস্কোপের নেশা নেই, তবু দেরি হয় কেন! সাতবার রাঁধতে রাঁধতে কড়া নামিয়ে রেখে সুবালা রাস্তার দিকে জানালায় এসে দাঁড়িয়ে দেখে; আঁকাবাঁকা গলি এইটুকুন পাড়াটা পাঁচ বার ঘোরা ফেরা করেছে; একটু বেশীদূর অগ্রসর হতে গেলেই বাড়ীর দেয়ালে দৃষ্টি আছাড় খায়। কিন্তু সুবালার ধৈর্য্যের সীমা নেই, কত লোক আসে যায়, আফিস থেকে কেউ বাজার করে

ফিরছে—এ-পাড়ারই বাসিন্দা সবাই, সামনে আসতেই সুবালাকে জানালা ছেড়ে আড়ালে লুকোতে হয়, চলে গেলে আবার সেই প্রতীক্ষা; ওদিকে হয়ত কড়ায় তেল চড়িয়ে এসেছে, পুড়ে গেল বুঝি সব—কিন্তু গুপীনাথের আর দেখাই নেই! পুরুষমানুষ অমন কত কাজ থাকে বাইরে—তা' বলে ভাবনা করলে কি চলে? সাতটা তাল মাথায় তা'র; কিন্তু তবু সুবালার ভয়টা একটু বেশী! কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা এদিক থেকে গাড়ী, ওদিক থেকে গাড়ী—রাস্তা নয়তো মানুষ মারা ফাঁদ! এতটুকু অন্যমনস্ক হয়েছো কি বাস্! এইতো সেবার বেশী দিনের কথা নয়, সুবালা ও-বাড়ীর জ্যাঠাইমার সঙ্গে কালীঘাটে গেছলো মা'র পুজো দিতে! গেছলো গঙ্গা পেরিয়ে হেটে—মন্দিরের সামনা-সামনি মোড়ের মাথায় একটা মাগী আর একটু হলেই তো পড়েছিল মোটরের তলায়—পড়েনি ভাগ্যিস্—মাগীর বরাত জোর, ড্রাইভারটাও ছিল হুঁসিয়ার—সেই কথাটা মনে হলে আজও সুবালার বুক কেঁপে ওঠে। বাস থেকে নেবে বাড়ী আসার পথে অনেকখানি হাঁটতে হয় গুপীনাথকে। মোটর, গাড়ী, ঘোড়া এড়িয়ে তবে বাড়ী এসে পৌঁছতে হয় বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! সুবালা কতবার গুপীনাথকে বলেছে কাল থেকে তোমায় আলাদা চার আনা পয়সা দেবো রিক্সা করে এসো।

ও পয়সায় এতখানি পথ রিক্সা আসে না। গুপীনাথ আপত্তি করে—চার আনায় তোমার বর যে, সে আস্বে—

সুবালার প্রত্যেকটি দিন এমনি সুপরিচিত। প্রাত্যহিক পথ-চলায় নেই পুনরাবৃত্তি! একই গতির একঘেয়েমিতে সুবালার এই চার বছরের জীবন নিঃশব্দে প্রবাহিত! সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলো আর অন্ধকারের অদ্ভুত নিয়মানুবর্ত্তিতা! কিন্তু হঠাৎ পরিবর্ত্তন

এল। সুবালার এই চার বছরের জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন হোল। প্রথম-পূর্ণচ্ছেদ—

পাশের বাড়ীটি এতদিন খাঁ খাঁ কোরতো—হঠাৎ কলরবে একদিন ভরে উঠলো। ভরে উঠলো মানুষ আর মানুষের সাজ-সরঞ্জামে! হাঁক-ডাক আর হৈচৈতে বাড়ীটা হোল সরগরম।

একটা বাদামী রংঙের শাড়ী জড়িয়ে বউটি ব্যস্ত হয়ে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বামীটি সুশ্রী—একটু অসাধারণ, অন্ততঃ এ-পাড়ার, এই কেরাণী পাড়ার কারু সঙ্গেই খাপ খায়না তার। দু'জনের বেশ সহজ সম্বন্ধ—স্বচ্ছন্দ গতি! বউটি এতো ব্যস্ত। সকালবেলাই এসেছে, ইতিমধ্যেই এতদিনকার অব্যবহৃত বাড়ীটি বেশ তকতকে—পরিষ্কার। বহুদিন ধরে ভুগে ভুগে কোন রোগী যেন আজ পথ্য করলো। কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে বউটি নিজেই ঝাঁটা হাতে জঞ্জাল পরিষ্কারে ব্যস্ত! বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে কলতলায় শ্যাওলা জমেছে—রান্নাঘরের ভেতর ঝুল আর কালীর রাজ্য—উঠানে কতদিনকার সঞ্চিত ময়লা—ঘাস আগাছা—আর ইট-পাটকেল। শোবার ঘরটা এখান থেকে স্পষ্ট নজরে পড়ে। একে-বারে স্পষ্ট! একটা তক্তপোশ পড়েছিল তারই উপর বিছানা পাতা হয়েছে—একপাশে দেয়ালের গায়ে তাকের উপর যাবতীয় জিনিষ সাজিয়েছে—দাঁতের মাজন-বুরুশ চুলের ফিতে—সিঁদুর কৌটো—তেলের শিশি—এটা আর ওটা!

সুবালা লক্ষ্য করলো কোথায় যেন এ-পাড়ার আর সবার থেকে ওর একটু তফাৎ একটু পার্থক্য আছে, বউটি হাসিতে উজ্জ্বল—কথায় প্রখর। নিজের চারিদিকে একটি মধুর চঞ্চল পরিবেষ্টনী রচনা করে রেখেছে; বউটির প্রকৃতির প্রাখর্য্য সুবালাকে পর্য্যন্ত এসে বিঁধছে—; বউটির যেন

একটু আকর্ষণী শক্তি আছে—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুবালা ওই বউটির মধ্যে হারিয়ে গেল—তলিয়ে গেল অজ্ঞাতে আর অসাড়ে—

গুপীনাথ নাকে-মুখে গুঁজে আফিসে ছুটলো। টুকিটাকি দু'একটা কাজ সেরে সুবালাও খেয়ে নিয়েছে। খেয়ে নিয়ে আচারের শিশি আর বড়ির হাঁড়ি শুকোতে দিতে ছাদে উঠেছিল; ছাদে উঠেই চোখোচোখি—

—আপনারা বুঝি এই বাড়ীতে এলেন—? কোত্থেকে এলেন?

—উলুবেড়ে; চেনেন তো, হাওড়া লাইনে, বিরশিবপুর, ফুলেশ্বর, উলুবেড়ে—

—ওমা; উলুবেড়ে চিনেন আর—সেখেনেই তো আমার বড়জা' থাকে—আমার ভাসুর যে ওখানকার ইসটিসনের—এই তো হামেসাই চিঠি লেখে বেড়াতে যাবার জন্যে, তা' সংসারের কাজেই দিদি ফুরসুত পাইনে,—তা বেশ হোলো ভাই—একলাটি এক বাড়ীতে থাকি—আমি ভাই মুখ বুজে থাকতে পারিনে—এর জন্যে উনি কত যে—

—সে কি কথা, বেশ বেশ—আসবেন আজ দুপুরে?

—আমাকে ভাই দু'বার বলতে হয়না, দুপুর বেলা একটা লোক পাইনে যে কথা বলি—কিন্তু আজ ভাই থাক্, আপনার কাজের ক্ষেতি—

বউটি ঠোঁট উল্টোলো; হাঁ কাজ তো ভারী—ও রয়েছে সব করবে'খন—

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট; তবু মেয়েলী-মন সুবালার। জিজ্ঞেস করলে—উনি কে ভাই আপনার?

—কে আবার!—বউটি চুপ করলে, অর্থাৎ উনি যে কে তা'ও আবার বলে দিতে হবে? এ প্রশ্ন এ কৌতূহল যেন সুবালার অহেতুক, অন্যায় অসঙ্গত!

যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুবালা বললে—তা' তো বটেই—

তা' তো বটেই। সুবালা কথাটা ব'লে এবং বউটি কথাটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। এই পরিচয় আদান-প্রদানই সব চেয়ে নীরস রুক্ষ জিনিষ। প্রথম আলাপের মধুর মুহূর্ত্তগুলি মাঝে মাঝে এদের স্পর্শে অশ্লীল হয়ে ওঠে। ভয় হয় বুঝি ভদ্রতার সীমা পেরিয়ে গেল। এর পরেই যদি স্বামীর কত মাইনের প্রশ্ন ওঠে? এই সব অনাগত প্রশ্নের ভয়ে দু'পক্ষ শিউরে উঠতে থাকে! তবু যা হোক্, এ ক্ষেত্রে কিছুই হোলনা।

সুবালা বললে—মানুষটি বেশ ভাই—আপনাদের দু'জনের খুব মিল না?

বউটি বুঝতে পারেনি। বল্লে—কোন্ মানুষটির কথা বলছেন?

আবার কে? আপনার স্বামী—

কথাটা বুঝতে পেরেই বউটি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো, তা' হাসি আসাই স্বাভাবিক! বউটি এমন সুখী! অমন স্বামী, সুবালা ভাবলে দু'টিতে বেশ আছে, একজোড়া পায়রার মতো! বউটিকে রূপসী বলা চলে বৈকি! স্বামিটিও বেশ! কেমন কথাবার্ত্তা—কেমন চাল-চলন! আবার তার মনে হতে লাগলো বেশ আছে; দু'টিতে বেশ আছে! সকাল বেলাই অত কাজের মধ্যেও সুবালা জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে—দু'জনে কাজ করছে, এটা রাখছে ওটা সাজাচ্ছে, আর এরই ফাঁকে ফাঁকে দু'জনের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ে আর অনর্থক হাস্য-পরিহাসে দু'জনের সান্নিধ্য মধুর হ'য়ে উঠেছে—হাসিতে আর কথায় ঘরটি মুখর হয়ে উঠেছে,...দু'জনে বেশ আছে সত্যি—

—কে বললে আপনাকে আমার স্বামী—বউটি জিজ্ঞেস করলে!

স্বামী নয় তো কে তবে? আপনি ভাবছেন আমি বুঝি কিছু দেখিনি? আপনারা তখন ঘরের ভেতর জিনিষপত্তোর গুছোচ্ছিলেন—আপনারা দু'টিতে বেশ আছেন ভাই—ছেলেপুলে হয়নি বুঝি? বউটি একটু হাসলে। সে হাসির অর্থ বোঝা কঠিন। একটু থেমেই বললে—আপনার?

—আমার?

সুবালা মহা সমস্যায় পড়লো। কী বলবে সে? সেই একদিন অন্ধকার অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে কে এসেছিল এই ঘরে—এই বাড়ীতে! নিষ্ঠুর সত্যের মতন সে তেমনি মর্ম্মন্তুদ। দেহ-সমুদ্র আলোড়ন করে বেরিয়েছিল একটি রক্তের ডেলা। শীতের সূর্য্যোদয়ের মত সে কাহিনী স্বপ্নময়—

আর বর্ষার আকাশের মত তা বিবর্ণ করুণ! সে কথা সুবালা ভুলে গিয়েছে! এতদিনের বিস্মৃতির তিল তিল ধূলিকণায় সে কথা আজ অবলুপ্ত! মনে হয় বৈকি মাঝে মাঝে; তবে মনে পড়লে সুবালার কান্না পায়। সে কি যন্ত্রণা—প্রথম চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে সুবালা দেখেছিল পৃথিবী হঠাৎ যেন এক রক্তপিণ্ডকে কেন্দ্র করে অপ্রতিহত বেগে ঘূর্ণ্যমান! সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সুবালা কতবার সেই কথা ভেবেছে এখন এমন হয়েছে, সেকথা সুবালা জোর করে ভুলে থাকে। সে-ই প্রথম—সে-ই শেষ! অপরিণত একটি কামনাকণা সুবালাকে তাই এমনি করুণ করে তুলেছে, সুবালা বললে আমার কথা বলছেন?…বেশ তো আছি নির্ঝঞ্ঝাট, আমার এক বড় বোন আছে ভাই হুগলীতে, পিঠোপিঠি বোন আমরা,—আমাদের দু'জনেরই হয়নি। মা বলে ভাই অমুক কর, তমুক কর, মাদুলি, শেকড়, হেনো-তেনো কত কী, কিন্তু যার হবার তার হবেই, কি বলেন—

দেখেন না রাস্তার ভিখিরীদের—আপনি মাতুলি-টাতুলি করে দেখেছেন না কি ?…

আধার বউটি হেসে উঠল ! চোখের দৃষ্টি আর ইঙ্গিতে বউটি যেন কী একটা গোপনীয় কথা বুঝিয়ে দিলে সুবালাকে !…দিয়েই হেসে উঠলো !… সুবালা মেয়ে মানুষ ! বেশী তাকে বোঝাবার দরকার করে না। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে বলে উঠলো, ও মা, তাই নাকি ? ক'মাস ?

—আট মাস চলছে—

বউটি পুলকে উচ্ছল। সুবালা ম্রিয়মান হোলো না। তেমনি চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল আর ঠোঁটের হাসি মধুর করে বউটির দিকে চেয়ে রইলো। এতক্ষণ সে বুঝতেই পারেনি ? আশ্চর্য্য ! এমন দু'টি সক্রিয় চোখ থাকতে সে অন্ধ হয়েছিল ! বউটির দিকে চেয়ে সে তার দেহটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ সুরু করে দিলে।

মুখে সুবালা বললে আট মাস ? তবে তো আর দেরি নেই ভাই, এই বাড়ীতেই খালাস হবেন তো ?

শাশুড়ীকে খবর দিয়েছেন ? প্রথম পোয়াতী কি না—করা-কম্ম করবে কে ?…ভয় করে বড্ড—

—এই তো আপনারা আছেন—

সুবালা বললে—তা' যেন আছি ভাই, কিন্তু আপনার মা কি শাশুড়ী হলে যেমন হয় তেমন কি আর—তবে শুনুন আমাদের এই পাড়াতেই—ওই যে দোতলা চিলে-কোঠা দেখছেন, ওই বাড়ীর এক বউ ভুগে ভুগে এই হাড়সার, অসুখ তো লেগেই আছে বারো মাস—গেল বছর এমনি সময়ে পুরো দশমাস হয়েছে—ব্যথা উঠলো রাত্তির বেলা, দাঁতে দাঁতে খিল লেগে গেল, মিনিটে মিনিটে ফিট—তা, ভগবানের এমনি লীলা ভাই—

ঈশ্বরের লীলা প্রচার ওইখানেই স্থগিত রাখতে হোল। ও-বাড়ীর নীচে থেকে ডাক এলো।…ডাক শুনেই বউটি চকিত হ'য়ে উঠেছে।—'দুপুর-বেলা আসবেন'—ব'লে দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে বউটি সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল!

তার পরদিন থেকে বাড়ীতে আর সুবালার মন টেঁকে না। গুপীনাথ খেয়ে দেয়ে অফিসে ছুটলো। সঙ্গে সঙ্গে সুবালাও চট্‌পট্ নিজের কাজ সেরে নিয়েছে। বাড়ীর দরজায় চাবি দিয়ে এ-বাড়ী এসে দরজার কড়া নাড়ে—

বউটি এসে দরজা খুলে দিয়ে বলে—এস ভাই, আজকে কিন্তু ভাই তোমার পনের মিনিট লেট—

—তা' কি করবো ভাই, সংসারের কাজ কি আর একটা, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ সব তো সেই আমাকেই, উনি অফিস বেরিয়ে গেলেন, ছিষ্টি পরিষ্কার-ঝরিস্কার করে খেতে বসেছি, খেতে ব'সে সাতবার ওঠা, হাত-মুড়কুত একটা লোকও তো নেই—নুন লঙ্কা গুড় এটা ওটা, তারপর খাওয়া সারা হ'ল তো, এঁটো বাসনগুলো কলতলায় ফেলে রেখে পান সাজতে বসলাম—ভাত খাবার পর একটা পান আমার চাই দু'বেলা, তা ভাই পানের বাজারেও কি আগুন লেগেছে তেমনি—এই দেখ, ঠিক এই এতটুকুন টুকুন তিন গাছি পান—এক পয়সা, অবাক করেছে ভাই—

গলাটা একটু নীচু করে সুবালা এবার জিজ্ঞেস্ করে—উনি বাড়ী নেই তো?

—থাকলেই বা—বউটি বলে, বাড়ীতে লোক এলে উনি ওই ঘরটি ছেড়ে বেরুবেন না! দেখেছেন তো—টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে কেবল পড়া আর পড়া; ওঁকে পড়ায় পেয়েছে, এই যে আমি ভুগছি—খিদে নেই অরুচি, এটা-ওটা সাতটা ভাল মন্দ খেতে ইচ্ছে করে—করে না

ভাই ?—তা আমাবার লোক পাইনে একটা—তা' পুরুষ মানুষের তো বোঝা উচিত ভাই !...

ঘরে বসে দেয়ালের গায়ে দেহ শিথিল করে এলিয়ে দিয়ে সুবালা পান খায়।

বউটি বলে—এই যেমন কাল—ওঁর খাওয়ার পর ভাতের থালা নিয়ে বসলুম। সন্ধ্যে থেকে খিদে খিদে, খিদের জ্বালায় প্রাণ যাচ্ছিল—খেতে বসে ভাতের থালা নিয়ে কিছু মুখে দিতে পারি না। কোথায় আচার, আমতেল, লঙ্কা, ঝাল, অমুক-তমুক—আমসত্ত্ব—কে আনে ভাই—ভালো লাগে নিজে সব করতে ?...বেশ ইচ্ছে করে গবগরে ক'রে ঝাল দিয়ে চুনো মাছ—কি পলতার বড়া—তা' উনি আবার একটু ঝাল দিলে অসহ্য—শুক্তনি কি উচ্ছে তো ওঁর ছুঁতেই নেই—নিজের জন্যে কি আর আলাদা করতে ভাল লাগে ? না, এখন, এই শরীরে অত বয় ?

সুবালা সহানুভূতিতে গদগদ হ'য়ে বলে ওঠে—তা' তো বটেই—

বউটি এবার একটু মধুর হাসি হেসে বলে—হোয়ে গেলেই বাঁচি ভাই—

কথাটা বলবার ধরণে সারা শরীরে আনন্দের ঢেউ শিউরে ওঠে। নতুন বর্ষার জলে ভরা নদীর মত উচ্ছল! চঞ্চল জল-কল্লোলে নিজেই নিজেকে মুখর করে রাখে ; নিজের গর্ব্বে নিজেই আত্মহারা—এক নিজে ছাড়া অন্য সব কিছু অনাবশ্যক, অবান্তর! ঘুরে ফিরে সেই একই কথা বউটির মুখে—ভরা বর্ষার মুখেই তো ভাই হবে—ভাবনা হচ্ছে একখানা কাঁথা নেই, একখানা কিছু নেই—কী করে যে কী করবো—'

সুবালা মাঝে মাঝে বিজ্ঞের মত অভয় দেয়—কিছ্ছু ভাববেন না ভাই—যাঁর জিনিষ তিনি ঠিক দেখবেন—এই তো সেবার ও-পাড়ার বড়-

বাড়ীতে—তবে শুনুন বলি—পুরোপুরি দশমাসে ছেলে বিইয়ে বড় মেয়ে মারা গেল—(আহা, কী মেয়েই ছিল ভাই, যেমন ব্যাভার তেমনি ·) তা, মারা তো গেল, সেই ছোট একটা পাখীর মতো বাচ্ছা—সবাই ভাবলে সেও যাবে—কিন্তু—রাখে কেষ্ট···সেই যে কথায় বলে—

একটি অনাগত আগন্তুককে কেন্দ্র করে দু'টি সখীর আলোচনা চলতে থাকে। শরীরের বর্দ্ধিষ্ণু অংশটি এবং তারই অভ্যন্তরের রহস্য নিয়ে এদের আলোচনাও যেন শতমুখ হোয়ে উঠে! শেষ পর্য্যন্ত কী হবে! কেমন করে হবে! নিস্তব্ধ ঘরের আবহাওয়ায়, রাত্রির নিবিড় নীরবতায়, একটি চঞ্চল শিশুর কল্পনাময় অস্তিত্ব যেন বাস্তব হ'যে উঠে! অস্ফুট আর অস্পষ্ট একটি শিশুর ক্রন্দনে সারা বাড়ী থম থম করছে! এখন তো এই এমন নিরিবিলি দেখছো—কিন্তু ক'দিন পরেই কাজের জ্বালায় আর এই বসে বসে গল্প করা চলবে না! চলবে না নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকা! সুবালা এ-বাড়ী এসে এই অনাগতের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে! সমস্ত অভূতপূর্ব্ব! যে আসছে, তার জন্যেই এই এত পর্য্যাপ্ত আয়োজন—প্রখর প্রতীক্ষা! এই সংসার—মানে এই বউটি, পাশের ঘরের ও-মানুষটি—এ-ঘরের ও-ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ এই দিনগুলি—সমস্ত যেন সেই তা'র আসার অপেক্ষায় উদ্বেল! এখানে, এদের এই বাড়ীতে এসে সুবালা বেশ থাকে!

মুখে সুবালা বলে—বেশ সাবধানে থাকবেন ভাই—প্রথম পোয়াতী কিনা—

সেই আর একদিন! সুবালার মনে আছে! এমনি ঠিক ছিল তার প্রতীক্ষমান দিনগুলি! অলস মুহূর্ত্তগুলি! কল্পনার রঙে রাঙা আর রমণীয়! দু'মাস আগের থেকে তার কতগুলো যে কাঁথা সেলাই করছিল—

দুধ খাবার বাটি আর ঝিনুকটি পর্য্যন্ত কিনেছিল বাসনওয়ালীদের কাছ থেকে পুরনো কাপড়ের বদলে—আর গুপীনাথ কিনে এনেছিল দোলনা একটা, দর কষাকষি করেও পাঁচ টাকার কমে কিছুতেই সেটা দেয়নি। কোথায় টাঙাবে সেই নিয়ে ভাবনা হয়েছিল ক'দিন—দুধ গরম করবার লোহার একটি ছোট উনুন—কাজললতা···আরও কত কী! কত সাবধানতা—কত আত্মসেবা—কত উৎকণ্ঠা! সেই দিনগুলোর স্মৃতি এই এ-বাড়ীতে এসে বসলেই সুবালার আবার মনে পড়ে! মনে পড়ে ছেলে হলে কি নাম রাখবে এই নিয়ে কত রাত সুবালা গুপীনাথের সঙ্গে আলোচনা করেছে! মনে পড়ে—পাছে কোনও অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে অন্ধকারে কোন দিন সুবালা বেরোয় নি! কিন্তু সে সব আয়োজন সেই সমস্ত সতর্কতা সব নিরর্থক হয়েছিল। দশ মাসের সঞ্চিত তিল তিল প্রয়োজনীয়তা একদিনে নিঃশেষে ক্ষয় হ'য়ে গেছলো! এখনও সন্ধ্যার সময় লাল আকাশের দিকে চেয়ে সুবালার সেই রক্ত-পিণ্ডের কথামনে পড়ে! অর্দ্ধ-অচেতনতার অন্ধকারের সেই একফোঁটা একটি ঘটনা আজ পর্য্যন্ত অক্ষয় হ'য়ে আছে! এতদিন এই কেরাণী পাড়ার অসঙ্কোচ একঘেয়ে গতি সে কথা বুঝি চাপা রেখেছিল—এবার ক'দিন হোল যেন সেই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে! এ বাড়ীতেও একটা দোলনা কেনা হয়েছে—আঁতুড়-ঘরের সাজ-সরঞ্জাম জমছে একে একে! কিন্তু সুবালার কেমন ভয় করতে থাকে! বউটিও যে প্রথম পোয়াতি!

বিকেল হ'তে সুরু হয়েছে—এমন সময়ে সুবালা উঠে পড়ে বলে—আসি ভাই—

বউটি দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল। সুবালা বললে—বউ রাত্তিরে যদি ব্যথা-ট্যথা ওঠে তো আমায় একবার ডেকো ভাই—জানালা

দিয়ে ডাকলেই শুনতে পাবো—বলা যায় না ভাই, প্রথম পোয়াতী ভয় করে!

তা' খালাস আজ কালকের মধ্যেই হবে আর কী! সময় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে! আজকাল যেন তার প্রতীক্ষা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে! অসহ্য হ'য়ে উঠছে বেশী করে সুবালার কাছে! কী হবে! কেমন করে হবে? বউটিও যে প্রথম পোয়াতী!

সে দিন অফিস থেকে ফিরতে গুপীনাথের অনেক রাত হোল। এমন রাত সচরাচর হয় না! কিন্তু সেই রাত অবধি হাঁড়ি কোলে ক'রে বসে থাকতে থাকতে সুবালার ভারি রাগ হোল। জানালার ধারে এসে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখে ব্যথা ধরে উঠলো। রাগ করে সুবালা শুতেই যাচ্ছিল এমন সময় গুপীনাথ এসে পড়েছে। সুবালা গুম্ হয়ে বসে রইল! কথা সে কইবে না!

গুপীনাথ হাত-পা ধুয়ে এসে দেখলে সুবালা ঠিক সেইখানে তেমনি ভাবে চুপ করে বসে আছে!

কাছে গিয়ে বললে, কি ভাত দেবে না নাকি, বসে আছ যে বড়?

গুপীনাথ বুঝেছিল রাগ হয়েছে! বললে—রাগ আছে দেখছি ষোল-আনা।

সুবালা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো—কেন, রাগ বুঝি আমাদের করতে নেই, সেই সকাল থেকে সংসারের পেছনে খাটছি, একটু তো ফুরসুৎ পাইনে, তার উপর এই রাত বারোটা পর্য্যন্ত হাঁড়ি কোলে করে বসে থাকা পারবো না আমি, মাইনে করে দাসী বাঁদী রাখোগে, আর পারবো না আমি, এই বলে রাখছি—

গুপীনাথ শুধু বললে—কী হয়েছে তোমার বল দিকিন—শুনি—

—কী হয়েছে তুমিই বুঝে দেখ, এই যে দুপুর রাত অবধি বসে আছি একটু মায়া-দয়া নেই বুঝি তোমাদের শরীরে? তুমি তো বলবে ভাত বেড়ে চাপা দিয়ে রাখলেই পারতে!…বলতে অমন সকলেই পারে! কাল থেকে আমি আর এ-সব পারবো না, পারবো না! পারবো না! দাসী বাঁদী দেখো—আমার শরীবে অত বইবে না। তা' বলে রাখছি।

—ওঃ এই কথা! কথাটা সত্যি! গুপীনাথ কথাটা অনেকদিন ভেবেছে! কয়েকদিন থেকেই গুপীনাথ দেখছিল সুবালা রোগা হয়ে গেছে অনেক! আগেকার সে স্বাস্থ্য আর নেই! একটা ঝি কি বাঁধুনী রাখা উচিত! সুবালার স্বাস্থ্য সত্যিই খারাপ হয়ে এসেছে! মেজাজ হয়ে এসেছে খিট্‌খিটে! একটুতেই চটে ওঠে! কতদিন থেকে গুপীনাথ লক্ষ্য করে আসছে সুবালা আর সেই আগের সুবালা নেই! কেন এমন হোল! অবশ্য খাটুনী যে আগের থেকে খুব বেড়েছে তা' তো নয়! আগেও গুপীনাথ আফিস থেকে ফিরতে কত দেরি করেছে, কিন্তু এমন রাগ কখনও করেনি সুবালা! না—গুপীনাথ ভাবলে ভেতরে ভেতরে কোনও অসুখ করেছে ওর নিশ্চয়ই! সে-অসুখ কোন দিন ভাষণভাবে আত্মপ্রকাশ করবে হয়তো! না, গুপীনাথ কালই ডাক্তার আনবে! অবিনাশ ডাক্তারের হাত-যশ আছে এ-পাড়ায়! তাকেই আনতে হবে!… টাকার মায়া করলে চল্‌বে না!…

ক্রমে রাত অনেক হোল! নিস্তব্ধ আবহাওয়া যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে! চট্‌ করে সুবালার ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। তার মনে হোল কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। অসহ্য যন্ত্রণায় বুক তার ভেঙ্গে যাচ্ছে; মনে হোল যে কাঁদছে সে যেন তার জানালার ওপাশ থেকে ডাকছে তাকে! 'দিদি ও দিদি'! মুহূর্ত্তে সুবালা উঠে বসেছে। বউটির ব্যথা উঠেছে।

রাত্রির অন্ধকার চিরে বউটি কাঁদছে—গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে! একটি অনাগত প্রাণী পৃথিবীতে আসবার জন্যে গলা ছেড়ে কাঁদছে! 'দরজা খুলে দাও, খুলে দাও দরজা।'

সুবালা কান পেতে শুনতে লাগলো; তার দু'চোখ ফোটেনি—দু'টো হাত দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে আলো খুঁজছে সে! আলোড়ন সুরু হয়ে গেছে। আলো তার চাই। মাটি ভেদ করে একটি তৃণখণ্ড মাথা তুলবে। ছোট একটা কুঁড়ি ফাটিয়ে ফুল বেরিয়ে আসবে। সে আসবে! সুবালা কান পেতে শুনতে লাগলো! অনেক দিন আগে আর একবার স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে সে এমনি অনুভব করেছিল। তার শরীরে শিরায় শিরায় সে অনুভব করেছিল; রক্তে আর রক্তের প্রবাহতে সুবালা শুনেছিল তার পদক্ষেপ। আজ এই রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সুবালার মনে হোল সে আবার এসেছে। সেদিনকার সেই অপরিণত রক্ত পিণ্ডটি সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে ও-বাড়ীতে ওই বউটির কাছে এসেছে। বিছানার ওপর উঠে বসে সুবালা সেই অন্ধকার নিরুদ্দেশের দিকে চেয়ে রইল। ও-বাড়ীতে একটি ঘরে এতক্ষণ সাড়া-শব্দ পড়ে গেছে। সুবালাকে ছেড়ে কেন সে ও-বাড়ীতে গেল? সুবালা কী দোষ করেছিল? সুবালাও তো তার জন্যে দোলনা কিনে রেখেছিল—কিনেছিল দুধ খাবার বাটি, ঝিনুক,—কিনে রেখেছিল খেলনা, পুতুল—ওরে কেন সে ও-বাড়ী গেল! এ-বাড়ী বুঝি তার পছন্দ হয়নি! সুবালা বুঝি ভালবাসতে জানে না! সুবালা বুঝি মা হবার যোগ্য নয়!...

ও-বাড়ী থেকে সেই অস্পষ্ট আওয়াজ আবার ভেসে এল—দিদি, ও দিদি—

তবে ও মরুক! সুবালা ভাবলে—ও মরুক তবে! যেমন দুষ্টু ও

তেমনি তার শাস্তি। অত যত্ন—অত খাতির—কিছুই যেন কিছু নয়। তার জন্যে সুবালা কত মাস কত দিন ধরে অপেক্ষা করেছিল। কত রাত ঘুমোয় নি—বসে বসে কত কাঁথা সেলাই করেছিল—সবই তো তার জন্যে! কত টাকা নষ্ট—কত সময় নষ্ট—স্বাস্থ্য নষ্ট—তবু সে আসেনি! ও-বাড়ীতে কী আছে? বউটির কাছে ও কেন যাবে? তবে মরুক্ ও! সুবালা ভাবলে—কিছুতেই সে যাবে না! যেমন দুষ্টু সে তেমনি তার শাস্তি হোক্।

—দিদি ও দিদি—করুণার্ত্ত স্বরে বউটির ডাক ভেসে আসছে।

সুবালার চোখের সামনে সেই রক্তের ডেলাটা ভেসে উঠলো! সেই তার এত তেজ! সুবালা চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে পড়লো! এই রাত্রে পরের বাড়ী যেতে তার দায় পড়ে গেছে! সে ঘুমুবে! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সে ক্লান্ত···রাত্রে সে ঘুমুবে! কেন সে ও-বাড়ী যাবে! ও-বাড়ীতে কী মধু আছে! সুবালা সেই বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। না সে কিছুতেই যাবে না। ও মরুক্ এ-বাড়ীতে যে আসেনি ও-বাড়ীতেও তাকে সুবালা আস্‌তে দেবে না!

হঠাৎ কান্না যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো!

···বউটি গলা ছেড়ে চীৎকার করছে।

সুবালা আবার উঠে বসলো! গুপীনাথকে বার দুই ডাকলে। গুপীনাথের সাড়া নেই। দরজা খুলে আস্তে আস্তে সুবালা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। সদর দরজা পার হয়ে ও বাড়ীর দরজা খুলে সুবালা ভেতরে গিয়ে ঢুকলো! বউটির স্বামী এখনি বুঝি বেরিয়ে গেল—বোধ হয় ডাক্তার আনতে! সেই অন্ধকার ভেঙ্গে সুবালা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠলো! মুহূর্ত্তগুলি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে! সুবালার চোখের

সামনে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভিড় করে দাঁড়ালো! বউটির গোঙানির শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে! ঘরে গিয়ে সে এখন কী দেখবে কে জানে! যদি দেখে একটা সদ্যজাত শিশু হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছে—যদি তাই দেখে সুবালা? দুই হাতের আঙুল দিয়ে তার গলাটা সুবালা টিপে ধরবে। টিপে ধরবে ততক্ষণ, যতক্ষণ তার নিঃশ্বাস, বন্ধ না হয়। টিপি টিপি পায়ে সুবালা সেই ঘরটায় উঁকি মারলে!...উঁকি দেওয়া মাত্রই এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে সুবালা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছে...

সেই প্রচণ্ড কান্নার শব্দেই গুপীনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। গুপীনাথ বিছানায় উঠে সুবালার অবিন্যস্ত কাপড় চোপড় সারা শরীরে ঠিক করে দিতে দিতে ডাকলে—শুনছো, ওগো, শুনছো—আরে শোনেই না যে—বলি, ভয় পেলে নাকি?...কাঁদছিলে কেন? ওগো—

এতক্ষণে সুবালার ঘুম ভাঙলো। জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বললে, চল আমরা চ'লে যাই এখান থেকে—গুপীনাথ কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—কী বলছ কী তুমি—পাগল হলে নাকি?...যাবো আবার কোথায়?...ওঠ ওঠ, উঠে ভাল হয়ে শোও—

সুবালার যেন ঘুম ভাঙেনি; তেমনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—কেন তবে ওরা এসেছিল?...

এই দেখ দেখি, অসুখ করেছে নাকি তোমার? কী যা-তা বক্‌ছো... কারা এসেছিল...? কে...? কা'র কথা বলছ...? দেখেছ, ঘুমুলে তোমার কাপড় চোপড়ের হুঁস থাকে না...ওঠ ওঠ একেবারে আগাগোড়া খালি...উঠে কাপড় পরে ভালো হয়ে শোও...

মুখে গুপীনাথ এই কথা বললে বটে, কিন্তু তার মনে হতে লাগলে সুবালার ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু একটা দারুণ অসুখ হয়েছে।

কোন দিন শেষকালে হয়ত ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করবে! না এমন ভাবে ফেলে রাখলে চলবে না। সুবালা সেই আর আগেকার সুবালা নেই। তার মেজাজ হয়ে গেছে খিট্‌খিটে একটুতে চটে ওঠে!...রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে কেঁদে ওঠে!...এ তো ভালো লক্ষণ নয়। না কালই ডাক্তার আনতে হবে। অবিনাশ ডাক্তারের হাত-যশ নাম-যশ আছে এ-পাড়ায়, তাকেই আনতে হবে! তার ফিস্ কিছু বেশী—তা হোক্ তাকেই আনতে হবে—টাকার মায়া করলে চলবে না আর।

মরা পাখীর পালক

স্বভাবতঃ আমি একটু নির্জ্জনতা-প্রিয়; তাই সবাই আমাকে ভাবে লাজুক। কাউকে আমি আনন্দ দিতে পারিনা; সাধারণ লোকে প্রথম পরিচয়ে আমার সঙ্গ কামনা করেনা। নতুন লোকেব সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হলে আমাকে বিপদে পড়তে হয়! তাই যখন যেখানেই আমি যাই, পরিচিতদের দৃষ্টি-পরিবেষ্টিত হওয়ার কুণ্ঠা আমায় ভোগ করতে হয়না। নিশ্চিন্তে আর নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করি; অপরিচয়ের অবাধ স্বাধীনতায় আমাব দিন কাটে! আমার কোনখানে ত্রুটি কোনখানে ফাঁকি—তা' ধরা পড়ার লজ্জা থেকে আমি বাঁচি!

কিন্তু তবু এইবার পুরীতে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। কী জানি প্রসাদবাবু কেমন করে বুঝি জানতে পেরেছিলেন আমি লেখক! নিজে থেকে এসে পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ করে তুললেন, তখন আর তাকে এড়াতে পারলাম না! এত লোকের মধ্যে আমি কেবল মাত্র একজন সঙ্গী পেলাম। সত্যি কথা বলতে, সেই দিন থেকে তাঁকে আমার ভালো লাগতে লাগলো; তার কারণ হয়ত এই যে, আমার লেখার তিনি নিন্দে করতেন!

সেদিন হোটেলের বারান্দায় চুপ করে বসেছিলাম। ওদিকে আরো ওদিকে, যেখানে ভ্রমণবিলাসী ছেলেমেয়েরা সমুদ্রের তীর ধরে হেঁটে চলেছে, সেখানে কত মানুষের ভিড়! সমুদ্রের জলের শব্দে—অস্পষ্ট অন্ধকারে—আর এই বহমান ঠাণ্ডা বাতাসের আবহাওয়ায় আমি নিজেকে বড় আপন ভাবে কাছে পেয়েছিলাম। সারা জীবনের অপরিচিত পথ চলায় কত

পরিশ্রান্তি—কত কষ্টার্জ্জিত অভিজ্ঞতা—কত অগণিত উদ্দেশ্যের অর্থহীনতা—সমস্ত আজ নিজের কাছে প্রকট হ'তে লাগল। এই বিশ্রাম, এ আমার কাছে কত অমূল্য! চিন্তায় আর পরিশ্রমে সারাজীবন কত স্বার্থ-ত্যাগ করেছি। অনেকদিন আগে কবে কার কাছে জিনিষ কিনে পয়সা দিতে ভুলে গেছি, কবে ট্রেনে কোন্ সহযাত্রীর কাছে বই পড়তে নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি, কবে আমার পায়ের চাপ লেগে এক বেবালছানা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল—এই সমুদ্রের অপরিমিত বিশালতার দিকে চেয়ে সেই সব দিনের ছোট ছোট খুঁটিনাটিকে কেন মনে পড়ছে! আরও মনে পড়ছে: একটি দিনের কথা, একটি মেয়ের কথা নিতান্ত আকস্মিকভাবে বিনা চেষ্টায় যাকে কাছে পেয়েছিলাম, কিন্তু চেষ্টা করেও যাকে ধরে রাখতে পারিনি। ওই প্রশান্ত পটভূমিকার ওপর অলস অপরাহ্নের এই বিশাল বিস্তৃতি এই বর্ণ-সুষমা এ আমার বড় ভালো লাগছে!

পাশেই আর একটা চেয়ার ছিল; কখন প্রসাদবাবু এসে সেটাতে বসেছিলেন টের পাইনি, একটু পাশ ফিরতেই নজরে পড়ল!

বললাম—নমস্কার, কখন এলেন?

প্রসাদবাবু বললেন—লেখক মানুষ আপনারা, সমুদ্রের দিকে চেয়ে কত কি ভাবছিলেন তাই বিরক্ত করিনি; কিন্তু কী দেখছিলেন বলুন তো? সমুদ্র? দেখে দেখে আমার চোখ ত' পচে গেল মশাই, অমন মূর্ত্তিমান একঘেয়েমি আর কখনও দেখেছেন! সেই প্রেমের গল্পের মত একঘেয়ে নয়, বলুন? কতবার যে এখানে এসেছি তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু চোদ্দ বছর আগে একদিন যা এসে দেখিছি, আজ এই এখন এই মুহূর্ত্তে সে রূপের এতটুকু পরিবর্ত্তন হয়নি। সত্যি সত্যি, আজ একটা অনুরোধ করব

আপনাকে—আপনারা আর ওই একঘেয়ে প্রেমের গল্প লিখবেন না, সত্যিকারের একটু নতুন কিছু লিখুন দিকি, নতুন দিকে চেয়ে দেখুন তো—জীবন আর সমুদ্র অনেক তফাৎ—মানুষের জীবন আপনাদের মত অত একঘেয়ে নয়—

প্রসাদবাবু যখন কথা বলেন—তাঁর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে—দাঁতগুলো নড়ে কপালের শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে—আর ঠোঁট দুটো কাঁপে! সেই সজীব চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে বুঝতে পারি, একদিন কত উৎসাহ কত উত্তেজনা ছিল ওই বুকে—কিন্তু কেন জানিনা মনে হয়: কোথায় অন্তরের প্রান্তদেশে বুঝি তার নিদারুণ দৈন্য—কোথায় যেন তার দুর্ব্বলতা!

বললেন—আজ আপনাকে একটা গল্প বলব, চলুন বীচের ওপর বেড়াতে বেড়াতে বলি: আমার এক বন্ধুর জীবনী। দেখবেন জীবন কত রূঢ় রুক্ষ, আর আপনাদের গল্প কত মেকি। এ নিয়ে আজ পর্য্যন্ত কেউ কোথাও লেখেনি, কিন্তু—একটু দাঁড়ান, টর্চ্চটা নিয়ে আসি।

চারিদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; বীচের ওপর ভিড় পাৎলা হতে সুরু হোল। সুসজ্জিতা আর কুসজ্জিতা ছেলেমেয়েদের কথাবার্ত্তায় বাতাস ভারী, টুক্‌রো কথা, গান, সিগ্রেটের ধোঁয়ায় মন বিরস হয়ে উঠলো। এই ভিড় ছেড়ে আমরা চক্রতীর্থের দিকে চলেছি। প্রসাদবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সত্তর কি আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ; আশেপাশের কোনও দিকে তা'র আজ ভ্রূক্ষেপ নেই। কবেকার কোন বসন্তের বিস্মৃত কথার জালে হয়ত উনি ধরা পড়েছেন—অশ্রুজলের তীর্থে যে কয়টা পূজার ফুল আজও শুকোয় নি হয়ত সেই সব কথা! সোনামাখা একটি মেয়ে—প্রীতিমতী একখানি মুখ, ভাসা ভাসা দু'টি চোখ, বাঁকা ভুরু আর রাঙা

ঠোঁট হয়ত পঞ্চাশ বছরের উজান ঠেলে আজ এই বৃদ্ধের মনে উদয় হ'ল ; চুপ করে পাশে পাশে চলতে লাগলাম।...

প্রসাদবাবু বললেন—মানুষের জীবনে কারো কারো এমন সময় আসে যখন মনে হয়ঃ এ কিছু না—এই বেঁচে থাকা! দিনের পর দিন প্রাণধারণ আর কুৎসিৎ পৃথিবীর গ্লানি বহন করে বাঁচা! এ কিছু না, কেবল শরীরের একটা ক্ষতচিহ্নের মত রক্তের নিঃসারতা প্রমাণ করা! কেবল ছন্দ-পতন! এক এক সময় সত্যিই এমনি মনে হয় আমাদের অথচ কোনও যুক্তিসঙ্গত উপায় নেই সেই যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার, দিনানুদৈনিক সেই অসহনীয় যন্ত্রণা—শুধু চলতে হবে একঘেয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি নিয়ে! দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তাপে বাতাস হয়ত দূষিত বিষাক্ত হয়ে উঠবে ; আমরা বেচে থাকি—নিঃশ্বাস ফেলি—নিতান্ত যান্ত্রিক অভ্যাসের মতই আমাদের সব করতে হয়, না করলে চলেনা, অথচ প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা মৃত্যুর ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করি, আমাদের জীবন বিষময় ফেনার স্পর্শে শিথিল হ'য়ে আসাত থাকে ; আমরা মরতে চাই, সমস্ত এই বিকৃতির থেকে মুক্তি পেতে চাই, কিন্তু হয় কি আমরা বেঁচেই থাকি, আর জীবনকে অভিশাপ দিই—ঠিক এমনি একটি লোককে আমি চিনতাম, তারই কথা আপনাকে বলব আজ—

তখন আমরা সমুদ্রের ধার ধার দিয়ে চলেছি। হঠাৎ এক একটা অতর্কিত ঢেউ এসে আমাদের পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অবিমিশ্র সাদা ফেনায় সমুদ্রের ধার শুভ্র হয়ে উঠছে। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে চিক্ চিক্ করে উঠছে নানা রঙের ঝিনুক—ছোট, বড়, মাঝারি। ভিজে বালির উপর দু'জোড়া পদচিহ্ন রাখতে রাখতে আমরা চলেছি ; অনেকদূরে পূব-মুখে ঝাউবন—ছাড়া ছাড়া বাড়ী—স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা

আর রোমাঞ্চ-সন্ধানী যুবক-যুবতীদের ভিড় এদিকে পাৎলা হয়ে এল। সমুদ্রের নীল জলে কষ্টুম-পরা শ্বেতাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গীদের দেহ এই অন্ধকারেও স্পষ্ট! সমস্ত কোলাহল আর কল্লোল পেছনে ফেলে আমরা অনেকদূরে চলে এসেছি—অতীত দিনের গল্প বলা আর শোনার পক্ষে একান্ত অনুকূল আবহাওয়া!...

প্রসাদবাবু বলতে লাগলেন—ধরুন সুমতিবাবু তাঁর নাম। নাম শুনে আমরা যে রকম চেহারার কল্পনা করি তাঁর চেহারা তেমন নয়। ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা একটি দেহ—বলিষ্ঠ বাহু—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অবয়বের একটি সুগঠিত সামঞ্জস্য; প্রথমেই দেখলে মনে হবে লোকটি সবল সুস্থ আর মানসিক শক্তিতে অটুট। সত্যি কথা বলতে, বাঙ্গালীর মধ্যে সে-রকম চেহারা দেখলে দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়—সেই উদ্ধত নাসিকা আর দৃঢ় চক্ষুর সামনে অনেককেই মাথা নীচু করতে হবে; কিন্তু আর কেউ না জানুক আমি তো জানতুম সে মানুষটির ভিতর কী গোপন দুর্ব্বলতা, অহরহ মনের মধ্যে তাঁর কী ব্যাধি-যন্ত্রণা—প্রাত্যহিক মুহূর্ত্ত যাপনে কী প্রবল মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা! অনেক সময় দেখছি সুন্দর দেখে যে ফুলটি গাছ থেকে তুলতে গেছি সেই ফুলটিতেই পোকা, সূর্য্যাস্তের রক্তিমাভার পেছনেই তো আছে রাত্রির কালো অন্ধকার! চক্‌চকে শান্ দেওয়া ছোরাতেই তো মৃত্যুর অনিবার্য্যতা! অর্থাৎ এককথায় যেখানে আমাদের সঙ্কোচ আর সন্দেহ কম, ভয় আর বিপদের উৎস সেখানেই লুকিয়ে; বন্ধুর কাছেই আমরা বিশ্বাসঘতকতা পাই, শত্রুর কাছে নয়। যাক্ গে, আসল কথা বলি: এই সুমতিবাবুকে দেখলেও সাধারণ লোকের সেই ধারণাই হবে! শান্ত সুন্দর সুস্থ মনের বুঝি একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ! কিন্তু যদি সকলে দেখতো কোথায় তাঁর গলদ—কোথায় কাঁটা

ফুটছে—বাইরের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে যদি কেউ ভেতরে ঢুকতো! কিন্তু সে কেবল আমি জানতুম—খুলেই বলি এবার—তার ছিল কুষ্ঠ—শ্বেত কুষ্ঠ—ওই নীল আকাশের এককোণে একটুক্‌রো বিবর্ণ মেঘের মত একটি দাগ অস্পৃশ্য আর অশ্লীল—

প্রসাদবাবু থামলেন। প্রশান্ত মুখের ওপর নীল জলের ছায়াপাত হয়েছে। সুমতিবাবুকে চিনিনা, সুমতিবাবুকে দেখিনি, সুমতিবাবু আমার কাছে কল্পনা, কিন্তু এই প্রত্যক্ষ লোকটিকে চিনি, এই প্রসাদবাবু—কবেকার বিস্মৃত-কাহিনী আজ এর মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—অভ্রভেদী আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলাম—এ যেন গল্প শোনা নয়—বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি…

প্রসাদ বাবু আরম্ভ করলেন—

—কী কোরে জানাব আপনাকে কী তাঁর যন্ত্রণা—কী তাঁব ব্যথা। বাইরে তিনি হাসতেন—গল্প করতেন—মনে হোত ভেতরটাও বুঝি তাঁর অমনি সাদা; কিন্তু বুকের মধ্যে তাঁর সারা জীবন চিতা জ্বলেছে—! আপনি বুঝতে পারবেন না কী ছিল তাঁর প্রতিভা! যদি কোনও দিন তিনি ব্যাধিমুক্ত হতেন তা'হলে দেশের লোক বুঝতো কত কাজের লোক তিনি! কিন্তু তা' হয়নি নিজের ব্যাধির দুশ্চিন্তা তাঁকে এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয়নি। তাঁর মনে হোত: ভগবানের অভিশাপগ্রস্ত জীব তিনি —যশ মান অর্থ শান্তি পৃথিবীর যা কিছু কাম্য তা' তাঁর জন্যে নয়! মনে হয়েছে: এ পৃথিবীর তিনিও তো একজন মানুষ—ভগবানের সৃষ্ট জীবের তিনিও তো একজন—এই তৃণ, আকাশ, বাতাস, সুখ, স্বস্তি এতে তাঁরও অধিকার আছে—তাঁরও অধিকার আছে চাঁদের আলোয়—মুক্ত বায়ুতে, অধিকার আছে বেঁচে থাকতে—সজীব আর সবুজ প্রাণ নিয়ে চলাফেরা করতে—তাঁরও অধিকার আছে আর সকলের

মত গানে আর গন্ধে পাগল হতে—হাসি আর কথায় উজ্জ্বল হতে; তিনিও মানুষ, তাঁর প্রতিবেশীর যা' আছে যেটুকু আছে তার চেয়ে বেশী আছে তাঁর; তবু তিনি নিঃস্ব, পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে। তাঁর যেন নির্ব্বাসন হয়েছে—ওদের পৃথিবীতে প্রবেশ করবার ক্ষমতা নেই তাঁর! তিনি অস্পৃশ্য—তাঁর দেহ ব্যাধি যুক্ত—তাঁর যে কুষ্ঠ আছে!

কী করে আপনাকে বোঝাব সেই দিনানুদৈনিক যন্ত্রণার ইতিহাস। তাঁর ব্যাধির অশ্লীল দাগটি যেন তাঁর জীবনের পথে—তাঁর বেঁচে থাকার পথে একটা বিরাট কলঙ্ক! অপরিচিত লোকের তীক্ষ্ণ-নিবদ্ধ দৃষ্টির আঘাতে তাঁর সমস্ত অঙ্গ সমস্ত ইন্দ্রিয় আগুনের মত অসহ্য হ'য়ে উঠত! কেন তাঁর দিকে লোকে চায়? কী তাঁর পাপ? রাস্তায় ঘরে বাড়ীতে কোথাও তাঁর শান্তি নেই—সান্ত্বনা নেই—সারা জগতের দৃষ্টি তাঁর ব্যাধিকে অনুসরণ করে অলক্ষ্য ও অশ্রাব্য বিদ্রূপ করছে! সারা পৃথিবীর কোথাও সহানুভূতি নেই। অসংখ্য পথচারী আর পথচারিণীর মধ্যে তাঁকে—কেবলমাত্র তাঁকে—চিহ্নিত লক্ষ্য করে জগতের সমস্ত লোক যেন অভিশাপ বর্ষণ করছে! তাঁর স্পর্শে বাতাস নাকি বিষাক্ত হয়ে ওঠে—তাঁর ছোঁয়ায় মাটি কলঙ্কিত হয়! পরিচিত বন্ধুরা দূর থেকে বিদায় জানায়—তাঁর বাড়ীতে আসতে তাঁদের হৃৎকম্প হয়! কেন তবে বেঁচে থাকা? তাঁর এক একবার মনে হোত—কেন তবে বেঁচে থাকা? আপনাকে প্রথমেই বলেছি—এক এক সময় আমরা মরতে চাই—মৃত্যুর ইচ্ছা আমাদের প্রবল হ'য়ে উঠে—তবু আমরা পারি না—দিনের পর দিন এই গ্লানি বহন করে আমরা বেঁচেই থাকি—বেঁচে থাকি আর জীবনকে অভিশাপ দিই; ঠিক এমনি হোত সুমতিবাবুর—! সারা পৃথিবীর পুঞ্জীভূত বিদ্রূপ যেন তাঁর শিরে দিবারাত্রি বর্ষিত হচ্ছে! মানুষ তাঁকে কাছে

পেতে চায় না। জানালা খুলে কত রাত তাঁর জেগে জেগে কেটেছে—কত চাঁদ আকাশে জ্বলে গেছে—ব্যাধির দুর্ভাবনায় তাঁর ঘুম উড়ে গেছে; জীবনকে বুঝি তিনি বড় বেশি করে ভালবেসেছিলেন তাই মরণ ছিল তাঁর চিরশত্রু। সারা জীবনে তিনি কোন মানুষের সহানুভূতি পান্‌নি—তাঁর দিন কেটেছে তাচ্ছিল্যে আর অবহেলায়! দুর্বিষহ বেদনায় তাঁর জীবন ছিল ভারগ্রস্ত।

কল্পনা করুন তো এমন একটি লোককে—পথে চলতে যাঁর ভয়—বাড়ীতে থাকতেও যাঁর অশান্তি। তাঁর ব্যাধি তাঁর ওই অস্পৃশ্য দাগই তাঁকে এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয় নি। অথচ সত্যি বলতে, সে-ব্যাধির এতটুকু যন্ত্রণা নেই—তবু অনেক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির চেয়েও এ যেন ভীষণ! সেই বিবর্ণ সদা দাগ নিয়ে চলাফেরা, সেই শ্রান্তিহীন দুশ্চিন্তা তাকে যে শেষ পর্য্যন্ত পাগল করেনি. সে কেবল তাঁর বিশাল ধৈর্য্যের গুণে। তাঁর মনে হোত: যদি ব্যাধিই তাঁকে ভগবান দিয়েছিলেন—তবে তাঁকে পাগল করেন নি কেন?—কেন সভ্য সমাজে, শিক্ষিত আবহাওয়ায় তাঁর জন্ম হোল। তবে কেন লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে থাকার জ্ঞান তাঁর হোল! কেন তাঁর জন্ম হোল না অতি নীচ-স্তরের বস্তিতে, যেখানে ব্যাধিকে কেউ ঘৃণা করে না, কারণ ব্যাধিগ্রস্ত সেখানে সবাই—সেখানে জন্মালে এমন নীরব লাঞ্ছনা তাকে ভোগ করতে হোত না—লজ্জায় ম্রিয়মান থাকতে হোত না; নির্ব্বিবাদে আর নিশ্চিন্তে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তাঁর আনন্দে কেটে যেত!—

প্রসাদবাবু এবার থামলেন। বললেন—একটা কথা আমার বলতে ভুল হয়ে গেছে।—সুমতিবাবুর বিয়ে হয়েছিল। একটি শান্তিময়ী সরলা মেয়ে—কী স্নেহ, কী সেবা নিয়ে সে যে সুমতিবাবুর সংসারে এসেছিল,

কী বোলবো! ব্যাধিগ্রস্ত লোকটিকে কী সে দেবে সান্ত্বনা, কেমন করে দেবে প্রেম…সেই ছিল তার একমাত্র চিন্তা! এই সত্তর বছর ধরে জীবনে তো অনেক জায়গাতেই ঘুরেছি—পাহাড়ের আর সমতলের সব জায়গাতেই আমার গতিবিধি, কত লোক, কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হোল—কিন্তু অমন একজন মহিলা আর দেখলুম না। সংসারে দৈন্য-দারিদ্র আছে—আছে তো? প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে, ক'জন মুখ বুজে সব সইতে পারে বলুন? নীরব হাসি দিয়ে প্রশান্ত স্নেহদৃষ্টি দিয়ে সমস্ত অনর্থকে কে ক্ষমা করিতে পারে, বলুন তো? অথচ সত্যিই তাঁর অন্তরেও দুর্য্যোগের ঝড় বইত—তবু যখনই গেছি—স্নেহ আর আতিথ্যের ত্রুটি কোথাও এতটুকু হতে দেখিনি! সুমতিবাবুর জীবনে যদি কোথাও সান্ত্বনা থাকত তো সে কেবল তাঁর ওই সহধর্ম্মিণীতে। কিন্তু তবু বলবো: সুমতিবাবু ভুল করেছিলেন…মস্ত ভুল…ওই বিয়ে করাই হয়েছিল তাঁর জীবনের চরম ভুল!…কেন?—সে কথা পরে বলছি—

এবার অনেকক্ষণ ধরে প্রসাদবাবু চুপ করে রইলেন। পার্শ্বে এই চঞ্চল সমুদ্র…আর সামনে কেবল বালির রাজ্য—আর এদের কেন্দ্র করে চারিদিকে অন্ধকারের বিশাল বিস্তৃতি!—সমস্ত মিলে এক অভিনব ইন্দ্রজাল রচনা করেছে! দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমুদ্রের বুকের ওপর একখণ্ড চাঁদ উঠেছে—মেঘে অর্দ্ধ-আবৃত মলিন চাঁদখানি, জলের উপর তারই আভা দুলছে…সেই দোদুল্যমান অস্পষ্ট রেখাটি জলের উপর দিয়ে সোজা আমাদের পায়ের কাছে পর্য্যন্ত এসে লুটিয়ে পড়েছে;—আমরা পূবমুখো চলেছি…

আবার সুরু হোল….

প্রসাদবাবু বললেন—সেইদিনটার কথা আমার আজো মনে আছে।

তখন শেষ-রাত্তির—অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের ঘরে আকাশভেদী উৎকণ্ঠা নিয়ে সুমতিবাবু আর আমি বসে আছি। ভেতরে ডাক্তার আর দাই ঢুকেছে। সমস্ত বাড়ীতে ভয় যেন মূর্ত্তি নিয়ে নিঃশব্দ পদে ঘুরে ঘেড়াচ্ছে! প্রথম প্রসব—উৎকণ্ঠা সে জন্যে ততো বেশী নয়—উৎকণ্ঠার কারণ ছিল অন্য—

সুমতিবাবুর ধারণা: পৃথিবীতে যে আসছে তার ভাল-মন্দর দায়িত্ব সুমতিবাবুর নিজের। তার যদি কুষ্ঠ হয়? তাঁর মত সাদা সাদা অস্পৃশ্য দাগ যদি তার গায়েও থাকে? তা'হলে কী হবে? কত বোঝালুম! সত্যি সত্যি শ্বেতকুষ্ঠ তো আর সত্যিকারের কুষ্ঠ নয়—কী বলেন—লিউ-কোডারমা কি আর কুষ্ঠ? চামড়ার ওপর সামান্য একটু প্যাচ—ছোঁয়াচেও নয়—আর বংশগতও নয়!...ডাক্তারী বইতে তো তাই বলে! কিন্তু সুমতিবাবু কিছুতেই বুঝবেন না! সেই রাত্তির বেলা অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে—সেই ঘরে বসে সুমতিবাবু যেন কেঁদে ফেললেন!

কী করে' আপনাকে বোঝাবো তখনকার সেই মনের অবস্থা! সেই বাতাসে দোদুল্যমান উৎকণ্ঠা! সেই ছুঁচের মতন সুতীক্ষ্ম আগ্রহ। কী হবে কী হবে প্রতিমুহূর্ত্তের সেই প্রবল আশঙ্কা! সেই জীবন-মরণ সমস্যা। সে কি কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছে? চুপ করে' দু'জনে বসে আছি! আর প্রহর গুণছি—হঠাৎ ভেতর থেকে শাঁখের আওয়াজ এল।

দুর্ব্বার কৌতূহল দিয়ে সুমতিবাবু ছুটলেন—

ছোট নবজাত ছেলে একটি। ছেলেটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করে দেখা হোল। দেহের গোপনতম আর তুচ্ছতম অংশটি পর্য্যন্ত খোঁজা হোল। কলঙ্কের চিহ্ন কোথাও আছে নাকি? কোথাও সেই ব্যাধির

একটি অস্পষ্ট দাগও কি দেখা যাচ্ছে? সেই অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে সুমতিবাবু ছেলেটির আগাগোড়া পর্য্যাবেক্ষণ সুরু করলেন। নেই—কোথাও নেই—! সুমতিবাবু দেখলেন—ডাক্তার দাই সবাই তীক্ষ্নদৃষ্টি দিয়ে দেখলে—নেই কোথাও ব্যাধির দাগ নেই! এত আনন্দ সুমতিবাবু কোথায় রাখবেন? সেদিন সেই মুখে যে প্রফুল্লতার প্রচ্ছায়া দেখেছিলাম জীবনে আর কোনদিন তো দেখলাম না!

কিন্তু সত্যি বলতে আমার নিজের ভয় কিন্তু তখনও কাটেনি!—কেন কাটেনি সে কথা পরে বলবো। আপাততঃ এই বলে রাখি: সেদিন সুমতিবাবুর সেই আনন্দে আমিও আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে তো পারছেন—যে মানুষ জীবনে হতাশ—ব্যর্থতাকে কেন্দ্র ক'রে যে-মানুষের দিন কেটে যাচ্ছে—যা'র পথ চলায় পাথেয় কেবল বাইরের অজস্র বিদ্রূপ—তার জীবনে এ কতখানি আনন্দ—তার প্রাণে এ কী সান্ত্বনা! তিনি যেন নতুন করে আবার জন্মগ্রহণ করলেন।—নতুন যেন সূর্য্যোদয় হোল। সুমতিবাবু পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে বাঁচলেন—তাঁর মনে হোল—পৃথিবীতে বেঁচে সুখ আছে—

কিন্তু প্রথম দিনটি থেকে ছেলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হোল। সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা! তার নতুন ঘর—নতুন বিছানা—নতুন আসবাব—এ-বাড়ীর সঙ্গে তার কোনও সংস্রব থাকবে না। এ-বাড়ীর প্রতিটি জিনিষ ও-শিশুর অস্পৃশ্য! এ রোগ ছোঁয়াচে নয়—স্পর্শদোষে এ রোগের যে উৎপত্তি হয়না সুমতিবাবু কি আর সে কথা জানতেন না? তবু বলা কি যায়—সাবধানতার মার নেই—

আলাদা বাড়ীতে বিজন মানুষ হ'তে লাগলো। মা তাকে প্রসব করেই খালাস! সুমতিবাবুর হুকুম হয়ে গেল: এ-বাড়ীর কেউ ওকে

ছুঁতে পারবে না। দাই এল—এল ঝি। মাইনে করা লোক এল স্নেহ আর সেবা দিয়ে বিজনকে মানুষ করে তুলতে। মা বাপ তাকে ছুঁতে পারবে না! সে-বাড়ীর কোন জিনিষও মা'র অস্পৃশ্য।

রাত্রিবেলা বিজন হয়ত কেঁদে উঠেছে: এ-বাড়ী থেকে সুমতিবাবু শুনতে পেলেন।—ছেলে কাঁদছে—দুধ খাবার জন্যে কাঁদছে। মা কাছে নেই—মাইনে করা আয়া সেও ঘুমোচ্ছে! ছেলে তখনও কাঁদছে! দু'জনে জেগে উঠলেন। কিন্তু উপায় নেই! খানিক পরে কাঁদতে কাঁদতে আপনিই খোকা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে—খুব ক্লান্ত হয়েছে হয়ত! সুমতি-বাবুর চোখে আবার ঘুম নেবে এল।—কাঁদুক আর যাই করুক—এ-বাড়ীর কেউ ওকে স্পর্শ করবে না!

সেই ছেলে—মা'র দুধ না খেয়েও যে বেঁচে রইল কেমন করে সেইটেই আশ্চর্য্য!

এমনি করে সেই ছেলে বড় হোল।

দিনের পর দিন—বছরের পর বছর গেল—বিজন বুঝে নিলে বাবা মা'কে ছুঁতে নেই। আলাদা বাড়ীতে সে আয়ার কাছে মানুষ। ঝি আছে—তারাই তার সব কাজ করে দেয়।—বাবা মা দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন।

পূজোর সময়—বিজয়ার দিন নতুন জামা কাপড় পরে খোকা এল। এসে সুমতিবাবুর সামনে দাঁড়াল।

নিচু হয়ে মা'র পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে যাচ্ছিল সুমতিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—না না—ছুঁয়োনা তা' বলে—হ্যাঁ দূর থেকেই—

দূর থেকেই নমস্কার শেষ হোল।—

এমনি বছরের পর বছর। যখন বয়স হোল—স্কুল পেরিয়ে কলেজে

গেল—তখন সে রীতিমত বুঝে নিয়েছে। কলকাতায় নতুন বাড়ীতে নতুন জায়গায় এসে সে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

সারা পৃথিবীতে সে একলা। বাড়ীতে শুধু চিঠি যায় আর তার নামে আসে টাকা। এর বেশী সম্বন্ধ সুমতিবাবু রাখতে চান্‌নি। বিজন মানুষ হোক—আকাশের মত বিশাল তার কল্পনা—সমুদ্রের মত অশান্ত তার স্বপ্ন—। মানুষ হোক সে—সুমতিবাবুর নিজের জীবন অস্তিত্বহীন—তাঁর যেন মৃত্যু হয়েছে—ছেলের সাফল্য দেখেই তার শান্তি!

শেষে সুমতিবাবুর আশা হোল: ছেলে মানুষ হবে! মানুষের মত মানুষ হ'তে সে পারবে। জীবনে কখনও সে দ্বিতীয় হয়নি—স্কুল থেকে কলেজে উঠেছে প্রথম হয়ে। যেন এত ছেলের মাঝে প্রথম হবার অধিকার কেবল মাত্র তার একলার। কলেজের সমস্ত অনুষ্ঠানে বিজনের সাহায্য অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। ডিবেটিং ক্লাব সরস্বতী পূজো—কোথাও সে বাদ নেই।

বছর বছর দেশে বসে সুমতিবাবু খবর পান এক একটা পরীক্ষার শেষে ছেলে কেবল ওই এক কথাই লেখে—এবার আমিই ফাষ্ট্ হয়েছি বাবা—

ঘর থেকে বেরিয়ে সুমতিবাবু এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে বলেন—কই, কোথায় গেলে তুমি?

সর্ব্বেশ্বরী পাশেই কোথাও ছিলেন হয়ত। সামনে এসে দাঁড়াতেই সুমতিবাবু বলেন—মঙ্গলচণ্ডীতলায় পূজোর সিদে পাঠাও—বিজু ফাষ্ট হয়েছে—

প্রত্যেক ছুটিতে সুমতিবাবু লেখেন—দেশে তোমায় আসতে হবে না—দার্জ্জিলিং কি অন্য কোথাও যাও—যা দরকার লিখবে—

কেবল চিঠি আর চিঠি। ছ'শো মাইল দূর থেকে একটি সজীব প্রাণের বার্ত্তা ব'য়ে আনে কেবল ওই একটি চিঠি! দিন গেলে দিন আসে—চিঠির পর চিঠি! সুমতিবাবুর টেবিলে চিঠির পাহাড় জমেছে। নিস্তব্ধ রাতে হঠাৎ কী যেন স্বপ্ন দেখে সুমতিবাবুর ঘুম ভেঙে যায়—

—শুনছো ওগো—

সর্ব্বেশ্বরী শুনতে পেয়ে উঠে পড়েন।—সুমতিবাবু বলেন—খারাপ স্বপ্ন দেখেছি একটা—টেলিগ্রাম করতে হবে—

এক একদিন বিকেল বেলা আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে চেয়ারটা বাইরে বাগানে এনে সুমতিবাবু বসেন। দূরে আমবাগানের মগ্‌ডালগুলোর ওপর যেখানে আকাশ নিচু হয়ে এসেছে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনেক সাধ বুকের মধ্যে জমা হয়ে ওঠে! এমন সময় বিজন যদি কাছে থাকতো! যদি সে এই এখন তার পাশে এসে বসতো! বসে গল্প করতো! ওদেশের গল্প—এদেশের গল্প! কিম্বা এমনও হ'তে পারতো এক বাড়ীতে এক সঙ্গে থেকে জীবনের শেষদিনটি পর্য্যন্ত ছেলের সাহচর্য্যে কেটে যেতো!

যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চারিদিকে—গুটি গুটি পায়ে অন্ধকার ক্রমে তাঁকে ঘিরে ফেললে সুমতিবাবু উঠে আসেন। ঘরে এসে বসেন। সর্ব্বেশ্বরী চিরকালই কমকথার লোক; বসে থাকেন চুপ করে—নয়তো শুয়ে থাকেন—অথবা কথাও নয় ঘুমও নয়—এটা ওটা নাড়েন চাড়েন।

সুমতিবাবু কাছে গিয়ে বলেন—চাবিটা কই আমার?

সর্ব্বেশ্বরী তবু একবার জিগ্যেস করেন—চাবি? চাবির এখন কী দরকার?

—বাক্সটার ভেতরে দরকার আছে আমার—

চাবি নিয়ে সুমতিবাবু বাক্স খোলেন। ছোটবেলায় বিজন যে ঝুম-ঝুমিটি নিয়ে খেলতো, যে জামাটি পরতো—তার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিষ তার ভেতরে পোরা আছে। সেগুলো একটা একটা ক'রে বের করেন—হাত বুলোন—নাড়েন, আবার রেখে দেন। ছেলেকে তিনি কোনও দিন স্পর্শ করেন নি—তাঁর নিজের ছেলেকে ছোঁবার অধিকার তাঁর নেই—তাই তার ব্যবহৃত জিনিষগুলি অমনি করে কৃপণের মত বাক্সের ভেতর পুরে রেখেছেন—যখন ছেলেকে কাছে পাবার ইচ্ছে হয়, বড় সাধ হয় ছেলের গায়ে হাত বুলোতে, তখন এই বাক্সটা বার করেন, বার করে পুতুল ঝুমঝুমি চুষিকাটি—এটা-সেটা সবগুলো নিয়ে অতি সাবধানে স্পর্শ করেন। ওইগুলোই তাঁর সান্ত্বনা, বহুমূল্যবান পাথের!

কিন্তু—যাই হোক—বিজন মানুষ হোল। সবগুলো পরীক্ষার পাশ থেকে মুক্ত হয়ে সে চাকরি পেলে—কোন কলেজের প্রফেসারী—

তারপর এল সেই দিন—সেই চির পুরাতন দিন—প্রজাপতির পাখার মত রঙিন্ আর রমণীয়—

এতক্ষণ পবে সুমতিবাবু থামলেন—

বললাম—তার বিয়ের কথা বলছেন?

বললেন—ঠিক ধরেছেন। তবে সাধারণ বিয়ের মত ঠিক নয়—এমন সময় আসে জীবনে, যখন মনে হয় পৃথিবী যেন গোলাপের পাপড়ীর মত নরম আর গন্ধময়। পৃথিবীর প্রথম বসন্তের মত রমণীয়! যখন কাউকে ভালবাসি; ভালবেসে আমরা সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে উঠি! তখন আকাশের তারা আমাদের করতলগত—সমুদ্রের রত্ন আমাদের

আত্মস্বাধীনে ; বাতাসে আলোতে আমরা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি ! নিজের সৌভাগ্যে নিজের রোমাঞ্চ হয়।…

তখন আমরা প্রেমে পড়ি। প্রেম—কোনও মেয়ের প্রেমে আমরা উন্মাদ হয়ে যাই। তখন পথে যে আমাদের বাধা দিতে আসে সে আমাদের শত্রু! সেই প্রেমের প্রথম অনিশ্চিত মুহূর্ত্তগুলি—সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রখর রোমাঞ্চের প্রথম দিনগুলি—কল্পনা করুন সেই প্রথম চোখে চোখে চাওয়া—চেয়ে থাকা—অপলকদৃষ্টিতে দণ্ডের পর দণ্ড দু'জনের দিকে চেয়ে থাকা—সেই দীর্ঘ চাহনি, যে চাহনি নিবিড়তম স্পর্শের চেয়েও রোমাঞ্চকর—যে চাহনির কেবলমাত্র একটি অর্থ আছে—আত্মদান! সেই চুরি করে চাওয়া—অস্পষ্ট অথচ নিস্তরঙ্গ নদীর জলের মত স্বচ্ছ—সেই সবার চোখ এড়িয়ে একটি পলক দেখে নেওয়া—সে-সব লেখক আপনারা, ভালো করে বর্ণনা করতে পারবেন—এক কথায় বিজনের সঙ্গে শ্রীলতার বিয়ের ঠিক—

কেমন করে বর্ণনা করবো জীবনের সেই প্রথম বসন্তোদয়ের কথা! যত পারো দুই চোখ দিয়ে দুই চোখের আলো নিঃশেষ করে দেওয়া—কল্পিত আলিঙ্গনের স্বপ্নে শিউরে ওঠা—চিন্তায় আর কল্পনায় বিয়ের পরের সমস্ত ঘটনাগুলোর আনুপূর্ব্বিক চিত্র আঁকা—সে সব আর আমি কত জানি বলুন—

পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে। সবাই জানে তাদের দু'জনের বিয়ে হবে। জিনিষপত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি দিনের শেষে আর একটি নবাগত দিনের উদয়—নিকটতম শুভমিলনের আগ্রহে তারা আগ্রহান্বিত। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরার পথে বিজন বললে—আর দু'দিন—

দু'দিন! শ্রীলতা বাড়ী ফিরে যেতে যেতে বললে—দুটো দিন দেখতে দেখতে যাবে—

সত্যি সত্যিই আর মাত্র দুটি দিন! কিন্তু সে দুটি দিন কী দীর্ঘ! কত অসহ্য সে দুটি দিনের দীর্ঘসূত্রতা। দুটি দিন—আটচল্লিশ ঘণ্টা! পৃথিবীর ক্রমপরিণতির ইতিহাসে ওই দুটি দিনের মূল্য কত অকিঞ্চিৎকর! প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের গতি কত বিলম্বিত! সূর্য্য আর চন্দ্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ—গ্রহমণ্ডলীর সুপরিচালিত গতিবিধি···সমস্তের যদি নিয়মিত কার্য্য-দক্ষতা সক্রিয় থাকে তবেই তো দুটি দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটবে। বিজনের এই ঘর দেখছো—এই টেবল্ চেয়ার, আয়না, চিরুনি, লাইব্রেরী সমস্ত জিনিষ দু'দিন পরেও ঠিক এমনি থাকবে। যেমন এখন আছে—অপ্রতি-হত অবাধ! তবুও জিনিষগুলোর অস্তিত্ব দু'দিন পরেই কত সুমঞ্জস্ ঠেকবে—কত সুন্দর ঠেকবে! শ্রীলতা তখন এই ঘরের চারটি দেয়ালের অবরোধে বন্দী হবে! এক ঘরে, এক প্রতিবেশে! শ্রীলতার দেহ স্পর্শ করলে তখন আর বে-আইনী বলা চলবে না! সে তার হবে—একান্ত তার! নিতান্ত নিরিবিলি ঘরে শ্রীলতা যখন ওই বিছানার ওপর শুয়ে থাকবে—সমুদ্রের ফেনার মত শাদা বিছানার ওপর বাঁকান দেহখানা এলিয়ে—তখন তার কাছে গিয়ে, পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে অলস মধ্যাহ্নের আবহাওয়া বিলাসিতায় কাটিয়ে দিতে পারে! কিম্বা শ্রীলতা যখন ওই আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চুলের বিনুনি করবে, অথবা দুটো হাত উঁচু করে তুলে খোপার ওপর আঘাত করে করে খোপাকে যথাস্থানে সু-প্রতিষ্ঠিত করবে,—তখন আর বিজনকে চোখ বুজিয়ে ঘুমোবার ভান করতে হবে না! কেবল মাত্র দুটি দিন! এখন যে বাতাস ঘরে বইছে সে বাতাস তখনও বইবে, কিন্তু তখন তা হবে নূতনতর প্রতিস্পর্শে রোমাঞ্চকর!

সে দুটি প্রতীক্ষমান দিনের বর্ণনা দিতে পারবো তেমন আশা করবেন

না আমার কাছে। সে বয়সও নেই—সে অভিজ্ঞতাও নেই! তবু এটুকু বলতে পারি সেই ছুটি দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের পদধ্বনি বিজন কান পেতে শুনতে লাগলো। আজ যে-সূর্য্য আকাশে জ্বলছে, এখন থেকে অবিশ্রান্ত জ্বলার পরও সে আবার জ্বলবে। নূতন উজ্জ্বলতা নিয়ে, পরিপূর্ণ প্রাখর্য্য নিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও সে উঠবে এই আকাশে। শ্রীলতা তা'র—মানে বিজনের অনিবার্য্য ভাগ্যকে অতিক্রম করে অন্তর্ধান হতে পারবে না।

দিনের সমস্ত পরিশ্রমের শেষে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে বিজন নিজের নতুন বাড়ীতে ফিরে এল। নতুন একটা বাড়ী সে এই উদ্দেশ্যে ভাড়া নিয়েছে।

শ্রীলতা একটু আগেই বিজনকে বলে গেছে—"এখন আব ভাগ্যকে ভয় করবো না—ভাগ্য যদি অস্বীকারও কবে তবু তুমি আর আমি পরস্পরের—"

আরো বলেছে—"আমরা দু'জনকে যখন পেযেছি, তখন দবকার হ'লে ভাগ্যকে অপমান করতেও দ্বিধা করবো না—আমি তোমার সঙ্গে আছিই—"

সুতরাং বিজন যখন বাথরুমে ঢুকলো তখন তাব মনকে পরিতৃপ্তই বলতে হবে! বিকেল হয়েছে। পশ্চিমদিকেব শার্সির ভেতব দিয়ে সূর্য্যের জাজ্বল্যমানতার প্রমাণপত্র বাথরুমের মেঝেব উপব এসে পড়েছে! বিজন এখনি তার সমস্ত শ্রান্তি টাবের ভেতরে ধুয়ে ফেলবে! বাঁ হাত দিয়ে কলের মুখটা খুলে ডান হাত দিয়ে জামার বোতামটা খুললে! ছর ছর করে জল পড়ছে...

সমস্ত বাথরুমটা সেই শব্দে মুখর হ'য়ে উঠলো।

জামাটা খুলে বিজন সেটা পাশের আলনায় রাখতে উপরে হঠাৎ কেমন করে একটা হাতের দিকে তার নজর পড়লো! নজর পড়তেই সে চমকে উঠেছে! তারই নিজের হাত! কাঁধ আর হাতের সংযোগ-স্থলের একটু নিচে—বিজনের দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ নিবদ্ধ হয়ে উঠেছে। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় সমস্ত ইন্দ্রিয় তার ভয়-সচকিত হয়ে উঠলো! সারা শরীরের কলঙ্কহীন শুভ্রতার পাশে অধিকতর শাদা একটি দাগ আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে!

ওটা কী, কী ওটা?

সূর্য্যের সেই আলোটুকুর কাছে হাতটা এনে বিজন দেখতে লাগলো ওটা কী, কী ওটা?

দুটি চোখের সম্মিলিত দৃষ্টি দিয়েও যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না! তার কি চোখ খারাপ হয়ে এসেছে···তবে হয়ত ঘর অন্ধকার! সহসা সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতে সুরু হোল। বাথরুম থেকে সেই অর্দ্ধ-অনাবৃত অবস্থায় বেরিয়ে এসে বিজন ঘরের ভিতব গিয়ে বসলো। চারিদিকে যেন সমুদ্রের গর্জ্জন, উন্মত্ত আলোড়ন চলছে। একটি ভীরু ভেলায় কে যেন একটি শঙ্কিতপ্রদীপ ভাসিয়ে দিয়েছে। ডান হাতের আঙুল দিয়ে বার বার সে দাগটিকে ঘষছে! মনে হোল: যেন চিরস্থায়ী দাগ—উঠবে না! শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আঙুলেব ডগায় এনেছে এনে সেই দাগটির ওপর সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে! জোরে আরো জোরে! উঠবে না! ঘষতে ঘষতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে··· তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে!

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ব্যেপে এক মহা কলরব উঠলো! সারা জগৎ কল-কল্লোলময়! বিজনের চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মত

সমস্ত ভেসে উঠছে! একটি নির্জ্জন জাহাজের ডেকের ওপর সে দাঁড়িয়ে—জাহাজ মাটির সংস্পর্শ ছাড়িয়ে মৃদুগতিতে দূরে চলে যাচ্ছে। দূরে দূরে দূরে একটি দুটি লোকের ক্ষীণাতিক্ষীণ আকৃতি দেখা যায়! কলশব্দ ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে! বিজন সাবা ডেকের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সে মাটির পৃথিবীতে ফিরে যাবে! সে নির্ব্বাসন চায়না—বৈরাগ্য চায়না—লোকালয়ের সমস্ত বন্ধনের মাঝে বন্দী হয়ে বেঁচে থাকবে। ধীরে ধীরে তীরের ওপর ক্ষীণ মনুষ্যমূর্ত্তিগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—শ্রীলতা, তার বাবা, মা—অস্পষ্টতার কুয়াশায় তারা মিলিয়ে গেল, বিজনের দু'চোখ জুড়ে কান্না এল—তার নির্ব্বাসন হয়েছে—সে অস্পৃশ্য—তার কুষ্ঠ হয়েছে—

বিজন স্বপ্ন দেখলে: আকাশের এককোণে একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য এক ব্যাধ তাকে তীর ছুঁড়লে—বিষ মাখানো তীর! সে-তীর ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে লাগলো পাখীর পাখায়। অপ্রত্যাশিত আঘাতে পাখী মাটি লক্ষ্য করে পড়তে লাগলো—আর তারই পাখা থেকে একটা পালক খসে' এসে উড়তে উড়তে পড়লো বিজনের গায়ে—সে পালকে মরাপাখীর রক্তের দাগ তখন ঘন হয়ে এসেছে।

বিজন ভাবলে: আর দুটো দিন! শ্রীলতা জানবে না, কেউ জানবে না, বিয়ে তাদের হয়ে যাক্‌। সামান্য একটু দাগ সে কোনও রকমে লুকিয়ে রাখবে। শ্রীলতা তার। ভাগ্যের প্রতিবন্ধকতা সে সইবে না কখনও। বিজনের একবার মনে হোল: কে আর জানছে—বিয়ে হোয়ে যাক্‌। আর একবার মনে হোল: সে শ্রীলতাকে সমস্ত খুলে বলবে।—শ্রীলতা কি এতদূর হৃদয়হীনা হবে? বিজন নিজের মনের স্বীকৃতি পেলে না।

সে রাত্রে কি বিজন ঘুমিয়েছিল? নিস্তব্ধ রাত্রের আবহাওয়া সচকিত চমকিত করে দিয়ে একটি প্রাণীর বুকফাটা কান্না ঊর্দ্ধে উঠে আকাশে গিয়ে মিলিয়েছিল। এ-কান্না সেই কান্না—শ্রাবণ রাত্রে বর্ষা যা কাঁদে কেয়াবনে! অশ্রান্ত অস্পষ্ট—অস্থির। সে-কান্না ব্যর্থতার পরিহাসে করুণ।

সেই রাত্রের অন্ধকারে বিজন বেরিয়ে এল পৃথিবীর প্রাঙ্গণে। উলঙ্গ বাস্তবতার মুখোমুখি। আত্মীয়, বন্ধু, সমস্ত ছেড়ে সেই রাত্রে সে বেরিয়ে পড়লো অপরিচয়ের রাজ্যে। সেই দিন থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ সে ঘুরে বেড়ায়—তার বিরাম নেই। কত লোকই তাকে দেখেছে, কত লোকের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়েছে—কিন্তু তার বুকের মধ্যে কত লোকের সমাধি আত্মগোপন করে আছে তা' যদি কেউ দেখতো! অর্থহীন উদ্দেশ্য নিয়ে কতজনই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়—সেও তাদের একজন। যদি কখনও এমন লোকের সাক্ষাতে আসে, এমনি আত্ম-ভোলা—পাগল-পাগল—পৃথিবীর স্নেহ-মমতা বিচ্ছিন্ন এমনি একটি প্রাণী, নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বয়ে ক্লান্ত—উদাসীন দৃষ্টি—পথকে আশ্রয় করে জীবনের দিন অতিবাহিত করছে—যদি এমন লোকের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয় আপনার—তা'হলে ভাববেন: সে-ও মানুষ হ'তে পারতো—মানমর্য্যাদাবান সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারতো—এটুকু মনে করে তাকে কৃপা করবেন যে অনেক দুঃখ পেয়েই সে অমন ঘরছাড়া—

গল্প শেষ করে প্রসাদবাবু চুপ করলেন।

বীচের ওপর রাত্রি ঘন হয়ে এসেছে। চঞ্চল সমুদ্র চঞ্চলতর হয়েছে··· পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে আবহাওয়া যেন ঝিমিয়ে এল। যেন কল্পলোকের আকাশ বেয়ে এসে পৌছুলাম প্রাত্যহিকতার মর্ত্ত্যে।

বললাম—তারপর ?

প্রাসাদবাবু বললেন—তারপর পূর্ণচ্ছেদ। কমা, সেমিকোলন্ পেরিয়ে একেবারে পূর্ণচ্ছেদে এসে পরিসমাপ্তি। মৃত্যু সুকঠিন, সুপরিচিত, সুশৃঙ্খল মৃত্যু। তবে পরলোকের মাঝে তার আত্মা তৃপ্তি পেয়েছে কি না, কি জানি—

হোটেলের কাছে এসে পড়েছি। বললাম—পরলোক কি আপনি মানেন—?

প্রাসাদবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। হোটেলের ভেতর নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। বাইরে সমুদ্রের গর্জ্জন তখনও অশ্রান্ত। নিজের ঘরে এসে মনের মধ্যে সমুদ্র-কল্লোলের সঙ্গে সমস্ত স্মৃতি-বিস্মৃতির আনুপূর্ব্বিক ঘটনাগুলো আবার মুখর হয়ে উঠলো।...

পররিন সকালে দেখি: প্রসাদবাবু যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। বাক্সটা বিছানাটা বাঁধা। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—কাল একটা কথার উত্তর দেওয়া হয়নি আপনার—দেখুন পরলোক যদি না মানি—তা' হলে কিছুই যে মানতে পারিনে।—পরলোক মানবোনা—ভগবান মানবোনা—তা' হলে নিজেকেই অবিশ্বাস করতে হয় যে—

তারপর আমার কাছে সরে এসে জামাটা খুলে দেখালেন—এই দেখুন বিজন মরে নি—শারীরিক মৃত্যু তার হয়নি—সে বেঁচে আছে—এখন তার নাম. শুধু বদল হয়েছে—প্রসাদ।—আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন—কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—নিজের চোখে দেখুন একটা দাগ পর্য্যন্ত আর শরীরে নেই—আজ আমি মুক্ত—কলঙ্কমুক্ত। কিন্তু এখন মুক্ত

হয়ে কী হলো? এখন আর বেঁচে কী হবে? যখন ব্যাধি সারলে শ্রীলতাকে পেতুম—পেতুম বাবাকে—পৃথিবীকে তখন সারল না। আজ সত্তর বছর বয়স, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার দিন—এখন আমি রোগ-মুক্ত,—বেঁচে থাকতে যাকে পেলাম না মৃত্যুর পরে তাকে পাবো এই আশ্বাসেই যে বেঁচে আছি। পরলোক যদি না মানি, তা'হলে যে ভগবানকেও মানতে পারিনে আমি?—আর সব সইতে পেরেছি কিন্তু পরলোক নেই এ-কথা সইতে পারবো না প্রাণে।

বিদায় নিয়ে প্রসাদবাবু চলে গেলেন—

হোটেলের বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হোল: আকাশের এককোণে একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য এক ব্যাধ তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লে—বিষ মাখানো তীর। সে-তীর ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে লাগলো পাখীর পাখায়; অপ্রত্যাশিত আঘাতে মাটি লক্ষ্য করে পাখী পড়তে লাগলো—আর তারই পাখা থেকে একটা পালক খসে এসে পড়লো পায়ের ওপর—সে-পালকে মরা পাখীর রক্তের দাগ তখন ঘন হয়ে এসেছে…



রঙ্গিলা নায়ের মাঝি

সন্ধ্যাবেলা বউ ডুবির চরে নৌকা বাঁধা হইল। আশার আর আনন্দের সীমা নাই। যতদূর চাও কেবল জল—ছল-ছল কল কল শব্দ করিয়া নৌকার গায়ে আসিয়া ঢেউগুলি আছাড় খাইতেছে। পাশের বউ-ডুবির চরে ঘন জঙ্গল। অনেক দিনের পুরাতন চর, জঙ্গলও অনেক দিনের। বালুর চর ঢালু হইয়া জলের উপর নামিয়া আসিযাছে। দেখিতে দেখিতে আশা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল।

মাঝিরা দুইজন নৌকা বাঁধিয়া তামাক সাজিতে বসিয়াছে। চরে নামিয়া হাত-পা ধুইয়াছে, সঙ্গে চিঁড়া মুড়ি আছে—তাহা দিয়া তাহারা শেষবারের মত আহার সমাধা করিবে। বিকাল বেলা সূর্য্যাস্তের সময় এবং তাহার আগেও গান করিয়াছে, হু-হু করা বাতাসের সঙ্গে তাহাদের গান চমৎকার লাগিয়াছিল। বনমালী আর আশা সারা বিকাল ধরিয়া একমনে তাহাই শুনিয়াছিল, চমৎকার গলা; গানটি কাহার রচনা কে জানে—কিন্তু বড় করুণ, পাড়াগেঁয়ে গান; গানের তাৎপর্য্য: মাঝিকে ডাকিয়া কোন্ বিরহী বলিতেছে, নাইয়া তুমি তো কত দেশ ঘোর, কত দরিয়া পাড়ি দাও, তুমি কি আমার বঁধুর খবর রাখ?...যদি কখনও তার দেখা পাও, তাকে বোলো আমি তার পথের দিকে চেয়ে এখনও বসে আছি—

ছইয়ের এধারে গলুই-এর কাছে বসিয়া আশা পা দিয়া জল ছিটাইতেছিল, নূতন বউ—বিয়ে হইয়াছে সেদিন—বছরখানেকও হয় নাই—কিন্তু এমন চঞ্চল! বনমালী যদি হুকুম দেয় তো আশা এখনই চরে গিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারে—তাহার এতটুকু ভয় করিবে না—

বনমালী মানা করিল—উঁহু পা দিও না জলে—দিও না বলছি—বঁধু শুনিবে না, জলের উপর পা দিলে কি দোষ হয় তাহা তাহার বোধগম্য হইতেছিল না। বনমালীর কথা না শুনিয়া আশা তেমনিই পা দিয়া জল নাড়াইতে লাগিল, বনমালী বলিল—দিও না বলছি পা, ও আশা, পা দিও না—তবু যদি কথা শুনবে—যে কথাটি বলব, সেইটি—জলে কত কুমীর-হাঙ্গোর আছে—সাপ-খোপ আছে—

আশা হাসিয়া ফেলিল—হ্যাঁ, জলে নাকি আবার সাপ থাকে! বনমালী এবার রাগ দেখাইল—থাকেনা তো থাকে না বেশ—সাপ থাকে না, কুমীর থাকে না, কিচ্ছু থাকে না—এই সন্ধ্যেবেলা জলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাক—শেষকালে সুরমার মত তোমাকেও কামড়ে দিক—আমি কিছ্ছুটি বলব না—

আশা তবু পা তুলিল না—কিন্তু বনমালীর মুখের ওপর চোখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুরমা কে? কে সুরমা?

—কে আবার! নিতান্ত তাচ্ছিল্যস্বর বনমালীর ও-ধারে চাহিয়া উত্তর দিল—সুরমার নাম শোন নি? যার কাছে কোনদিন শোন নি? সুরমা—সুরমা তিন অক্ষরের সেই অতি প্রিয় নামটি বনমালী স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিল দুই দুইবার।

—ওঃ দিদির কথা বলছ?…

এবার আশা বুঝিতে পারিয়াছে। বনমালীর আগের পক্ষের বউ-এর নাম সুরমা।

আশা বলিল—দিদিকে ত' সাপে কামড়েছিল, না?

বনমালী চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া ছিল। কি কথা বলিতে বলিতে কি কথা উঠিয়া গেল! কোথা দিয়া কি হইল—আজ এতদিন পরে হঠাৎ

কথায় কথায় তার কথা কেন মনে পড়িয়া গেল! আগে আগে সুরমার কথা ভাবিতে গেলে বনমালী ভারী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত—কাঁদিয়া ফেলিত এক এক সময়; সুরমার একটা ফটোও বাঁধাইযা রাখিয়াছিল ঠিক বিছানার উপর দিকের দেওয়ালের গায়, কিন্তু এই আশা আসিবার পর সেটা বনমালী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে! কি হইবে রাখিয়া? সারা জীবন মন খারাপ রাখিলে বাঁচিবে কেমন করিযা? কিন্তু এতদিন পরে সেই কথাটি আবার কেন মনে পড়িল! বনমালীব মনে হইল, মনে না পড়িলেই বুঝি ভাল হইত। যাহারা চলিয়া যায় তাহাদেব কেন মনে রাখা! কেন তাহাদের আশায পথ চাহিয়া বসিযা থাকা! সুরমাকে আর মনে রাখিবার দরকার নাই, সুরমাকে এবার হইতে বনমালী একেবারে ভুলিয়া যাইবে! সেই বিপুল জলরাশিব দিকে চোখ রাখিয়া বনমালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাই ভাল তাই ভাল—সুরমাকে সে একেবারে ভুলিবে।

আশা বলিল—আচ্ছা আমায যদি সাপে কামড়ায তুমি কি করবে?

বনমালী রাগিযা উঠিল—কি সব তোমার অলুক্ষণে কথা—আর কোনও কথা নেই তোমাব মুখে—তোমার কি হ'ল বলত ·?

আশা তাহাব প্রথম প্রশ্নের জেব টানিযা বলিল—দিদিব মত যদি আমি মরে যাই—তুমি আবার বিয়ে করবে ত'?—বল না—ওগো, চুপ করে রইলে কেন—বল—উত্তব দাও—

বনমালী এবার ভীষণ রাগ করিল, বলিল—কখ্খনো বলবা না—বলব নাত—কেন, মরা ছাড়া বুঝি তোমার কোনও কথা নেই মুখে—মরা মরা—মরতে তোমার বড় সাধ—আর আমি যদি মবে যাই?

টপ করিয়া আশা বনমালীর মুখে হাত চাপা দিল। ওগো, আর

কখ্খনো বলব না—কখ্খনোও না—আমার ঘাট হয়েছে—হ'ল এবার? মাগো—তোমার মুখে কিচ্ছু আট্কায় না—তুমি সব পারো—

এই ঘটনায় বনমালীর আর একটি দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও সুরমা ঠিক এমনি করিয়া তাহার মুখ চাপা দিয়াছিল। একটি কথাও বলিতে দেয় নাই। তারপর দেশে গিয়া বনমালীর নাম করিয়া চণ্ড-ভৈরবের মন্দিরে পূজা দিয়া আসিয়াছিল। ইহারা সবাই এক রকম। সেদিনকার সুরমার সহিত আজিকার আশার এতটুকু তফাৎ নাই। এই আশা তাহাকে যেমন ভালবাসে সুরমাও ঠিক তাহাকে তেমনি করিয়াই ভালবাসিত, তবে তাহাকে বনমালী এমন করিয়া ভুলিয়া গেল কেন? চোখের আড়ালে যে চলিয়া যায়—মনের আড়ালেও সে যে চলিয়া যায় না সে কথা কে বলিল। মিথ্যা কথা—চিরকাল কেহ কখনও কাহাকে মনে রাখিতে পারে?—সেও যে সুরমাকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার কি দোষ!

ক্রমে চারিদিকে আরও অন্ধকার হইয়া আসিল। অস্পষ্ট কুয়াশার মত চারিদিকের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কেবল অন্ধকার—সামান্য একটু চাঁদের আলো পড়িয়া জায়গায় জায়গায় চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে; চরের জঙ্গলে একসঙ্গে অসংখ্য ঝিল্লী কলরব জুড়িয়া দিয়াছে—ইহাদের মধ্যে বসিয়া বনমালী আর আশা সীমাহীন কাল হইতে খসিয়া পড়া এক একটি মুহূর্ত্ত কুড়াইয়া সঞ্চয় করিতে লাগিল—

জোয়ার আসিবে রাত্রি দু'টায়—সেই জোয়ারে নৌকা ছাড়া হইবে। মাথা-ভাঙার উত্তর দিকে খালের ভিতর দিয়া বড় নদীতে পড়িবে—সেখান দিয়া গিয়া বাবুঘাটার জেটিতে ষ্টীমার ধরিতে হইবে। চিঁড়া মুড়ি বাহির করিয়া মাঝিরা খাওয়া শেষ করিয়াছে—বনমালীও সঙ্গে খাবার আনিয়াছিল

দু'জনে মিলিয়া শেষ করিল। খাওয়ার শেষে একজন মাঝি সুর করিয়া গান ধরিয়াছে—

…কোন বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া কে যেন বলিতেছে—তোমার লাগিয়া আমার চক্ষের পানি আর বক্ষের ব্যথা বাধা মানে না—তোমার আশায় সারা-জীবন আমি পথের পাশে বসিয়া আছি—তুমি বারেক আসিয়া আমার দরদ জুড়াও…

সুরে কথায় গানটি বনমালীর ভারী চমৎকার লাগিল। আশাও তন্ময় হইয়া গিয়াছে। এই পরিপূর্ণ উন্মুক্ত আবহাওয়ায় আর মনের এই অতি-পরিচিত প্রতিবেশে গানটি বনমালীকে অবশ করিয়া দিল।

আশা পাশে বসিয়াছিল। আরও পাশে আসিয়া বলিল—তুমি ত' বাঁশী বাজাতে এককালে, না?

বনমালী বলিল—কে বললে তোমায়?

—কে আবার বলবে! সবাই ত' জানে। পাড়ার সবাই বলে—সেদিন ভঞ্জদের বড়বৌ বলছিল—যাত্রায় নাকি তুমি কেষ্ট সেজে বাঁশী বাজাতে। মা'র কাছে শুনেছি—এইটুকুন্ বেলা থেকে তোমার নাকি বাঁশীর সখ ছিল—একবার বাঁশী কেড়ে নিয়েছিল ব'লে কি কান্না—ভাতপর্য্যন্ত খাওনি—আচ্ছা যদি অত সখ ছিল ত' এখন আর বাজাও না কেন?

বনমালী কথা কহিল না।

—হ্যাঁ গো, সে বাঁশীটা গেল কোথায়?—আমার বিয়ের পরে তো দেখতে পাইনি—তুমি নাকি বাঁশী বাজালে পাখীরা ডেকে উঠতো—সত্যি সত্যি একদিন শুনিও আমাকে, বাঁশী শুনতে আমি ভারী ভালবাসি—সে বাঁশী রেখেছ কোথায় বলতো?

বনমালী বলিল—এই গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি—

আশার বিশ্বাস হয় না। বলিল—আহা, সব কথাতেই তোমার ঠাট্টা। সাধের বাঁশীটা জলে ফেলে দিলে?—কার ওপর রাগ করেছিলে, শুনি?

—তোমার দিদির ওপর—

আশা বুঝিতে পারে নাই, বলিল—দিদি কে?

—সুরমা—

কথাটা বলিয়াই বনমালী বুঝিল মিথ্যা কথাটা বলা তাহার উচিত হয় নাই। সত্যসত্যই সুরমার উপর রাগ ত' সে করে নাই। রাগ হইয়াছিল বাঁশীর উপর—সেই রাগেই সে বাঁশী বাজানো ছাড়িয়া দিয়াছে।—নিশীথরাত্রে বনমালীর যখন ঘুম আসে না—বন-তুলসীর গন্ধে বাতাস উন্মত্ত হইয়া উঠে—তখন সেই সময় ছাদে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে তাহার ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে, বাঁশীর ফুটা দিয়া প্রাণের সমস্ত গোপন কথা আকাশে এবং আকাশের তারকালোকে ছড়াইয়া দেয়। যেখানে মর্ত্ত্যলোকের বাণী পৌঁছায় না, সেই গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে তাহার বাঁশী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া মরুক!—

আশা বলিল—চুপ ক'রে রইলে যে বড়—বললে না তো?

—কি বলব?

আশা বলিল—কেন দিদির ওপর রাগ করেছিলে—

—সে অনেক কথা—

আশা বলিল—হোক অনেক কথা, বলতেই হবে—না বললে শুন্‌ছিনে—আমাকে বল্‌তে তোমার কি হয়েছে—আমি ত' তোমার পর নই—

সে আজ চার বছর আগের কথা। গ্রীষ্মকাল, জমিদারীর কাজে বনমালীকে শহরে আসিতে হইবে। অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া সুরমাকে

বনমালী শান্ত করিয়াছিল। বাহিরে গরুরগাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া বনমালী উঠিতে যাইবে, এমন সময় বলা-নাই কওয়া-নাই একগলা ঘোমটা দিয়া সুরমা সরাসরি গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

তখন আর কেইবা বোঝে—আর কেইবা বোঝায়; সে সময় নাই তখন। বনমালী শুধু বলিয়াছিল—কোথায় যাবে তুমি?

কি জানি কেন—বোধ হয় অকারণেই—সুরমা বলিয়াছিল—"চুলো"—বনমালীও রসিকতা করিয়া বলিয়াছিল—চল সেখানেই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি—

শহরের তিন মাইল দূরে সুরমার বাপের বাড়ী, সেখানেই যাওয়া আপাততঃ স্থির হইল। নৌকায় পথে দু'দিন কাটাইতে হয়। ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে একটা গোটা দিন বেশ কাটিয়া গেল। চাঁদের আলোয়—আর অবাধ খোলা হাওয়ায় সুরমার কি স্ফূর্তি—কোলে মাথা রাখিয়া রাখিয়া শুইয়া শুইয়া আকাশ দেখা—মাঝির গান শোনা; রাত্রি-বেলা দূরে অন্ধকারের মাঝে টিম্ টিম্ করিয়া দুই একটা আলো জ্বলে—কোন নৌকার আলো হয়ত, এই তীর—এই একেবারে অকূল-পাথার। পৃথিবীর কোনও ভাবনা নাই—দুঃখ দৈন্যময় পৃথিবীকে এড়াইয়া যেন তাহারা অমর্ত্ত্য লোকে আসিয়াছে।...

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা মাঝিরা একটা চরে নৌকা বাঁধিল। চারিদিক তখনও বেশ অন্ধকার—সকাল ভাল করিয়া হয় নাই। রাত্রে বনমালীর ভাল ঘুম হয় নাই তাই আর মিছামিছি ঘুমাইবার চেষ্টা না করিয়া বাঁশীটা লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিল।

সামনে কেবল জঙ্গল। চরের উপর কতদিনকার গাছপালা নদীর জল পাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে ঠিকানা নাই। কত ভয়ানক জীবজন্তু উহার

ভিতর আছে কে জানে? ঘন-সন্নিবিষ্ট ডালপালায় দৃষ্টি যায় না। এক একবার হাওয়া আসে, সারা বনস্থলীতে একটা থম্‌থম্ আলোড়ন হয়।

বনমালী বাঁশী লইয়া বাজাইতে লাগিল। সুরে আরম্ভ হইয়া উঠিতে পড়িতে কোমল রেখাব, কোমল গান্ধার, ছুঁইয়া ছুঁইয়া ভৈরবী উপরে চড়িতে লাগিল; কোমল ধৈবতে দাঁড়াইয়া হেলিতে-দুলিতে কোমল নিখাদ ছুঁইল—তারপর কত পথে সুর চলিল। অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী একটি পাহাড়ী মেয়ে কোমরে কলসী লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ী পথে ঘুরিতে ফিরিতে সোজা ও নীচু হইয়া গ্রামে চলিয়াছে। তাহারই চলিয়া যাওয়ার ছন্দ—তাহারই বিরহ-বিধুর অন্তরের দ্বন্দ্ব—তাহার গতিভঙ্গীর সরস ব্যঞ্জনা লইয়া বাঁশীর গান বাজিয়া চলিল। সুরের শরজালে আকাশের আবহাওয়া আচ্ছন্ন হইয়া চলিল। নিবিড় অনুভূতি লইয়া বাতাস চুপ করিয়া কান পাতিয়া আছে—জলের তরঙ্গ যেন নিশ্চল হইয়া গিয়াছে—আকাশ মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

নৌকার ভিতর সুরমা ঘুমাইতেছিল—কখন বাঁশীর শব্দে জাগিয়া উঠিয়া পাশে আসিয়া বসিয়াছে। মাঝিরাও ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। পৃথিবীর জড় জীবজন্তু সমস্ত যেন সুরের মন্ত্রে অবশ হইয়া আছে। জলের মৃদু-স্রোতের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে সুর চলিল। সেই ভোরবেলা সমস্ত বনস্থলী যেন সুরের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সুরের ঢেউ ভাসিতে ভাসিতে দূরে অনেক দূরে কোন গ্রামান্তের কোন তীরে, কোন গৃহকোণে কোন বিরহীর বক্ষে কাঁদিয়া কুটিকুটি হইতে লাগিল, সীমা নাই—শ্রান্তি নাই—নূতন নূতন বেদনা-সম্ভার লইয়া সেই ভরা-বুক নদীর দুই কিনারা ভাসাইয়া দুই কূল ছাপাইয়া সুরের জোয়ার ছুটিল। এ সুরে যেন নেশা আছে—এ যেন মানুষকে বড় দুর্ব্বল করিয়া দেয়। তখন সব ভুলিতে হয়

—এই পৃথিবীর শ্রান্তি, ক্লান্তি. ব্যর্থতা, নীচতা, দৈন্য—সব সেই বাঁশীর সুরে মিলাইয়া যায়, সুরের মোহিনীমায়ায় অতিবড় দুর্দ্ধর্ষ জন্তুও কেমন নিজের অজ্ঞাতে মাথা নীচু করে, এ বাঁশীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হয়। সেদিন সেই নদীপারের চরের উপর বাঁশী এক অপূর্ব্ব কান্না কাঁদিতে লাগিল—

সকলেই চুপ,—হঠাৎ সুরমার কি হইল কে বলিবে—একটা পা নৌকা হইতে ঝুলাইয়া দিল।—আরাম করিয়া বসিবার জন্য হয়ত।…

কিন্তু পা ঝুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে সুরমা "মা-গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

বাঁশী ফেলিয়া রাখিয়া বনমালী সুরমাকে ধরিতে গেল—সুরমাকে ধরিল—কিন্তু মুহূর্ত্তেই দেখা গেল একটা সাপ কিলবিল করিতে করিতে চরের উপর দিকে চলিয়া গেল।

অভাবনীয় কাণ্ড!

বেদনায় চীৎকার করিতে করিতে সুরমা নৌকার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। খুব বিষাক্ত সাপ নিশ্চয়ই—অন্ধকারে যতটা দেখা যায় সাপের চেহারা দেখিয়াই বনমালী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

ক্ষতস্থানের ঠিক উপরেই বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু হইলে কি হয়—সারা শরীর ক্রমে নীল হইয়া আসিতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি ঘোলা হইতেছে; সে কী যন্ত্রণা-কাতর চীৎকার—অত যে লাজুক মেয়ে সে-ও গলা ছাড়িয়া আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া চেঁচাইতেছে। দেখিতে দেখিতে ক্রমে এক ঘণ্টার মধ্যেই সব যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল—বনমালীর চোখের সামনে, তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া সুরমা মরিতে চলিল—

তারপর সেই নৌকা করিয়াই যতশীঘ্র পারা যায় কাছাকাছি কোন গ্রামে

তাহাকে আনা হইল—বাঁচাইবার চেষ্টা যথাসাধ্য হইল—কোথায় ডাক্তার কোথায় বদ্যি—ওই যে অনেক দূরে একটা কালো জঙ্গল মতন দেখিতেছ, —ওইখানে শ্মশানে তাহাকে পোড়াইয়া বনমালী একলা নৌকা করিয়া ফিরিয়াছিল।

গল্প শেষ করিয়া বনমালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আশা এতক্ষণ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। বনমালী থামিতেই বলিল—তারপর ?—বাঁশী বাজান সেই দিন থেকেই ছেড়ে দিলে ?

—সেদিন থেকে নয়—তার পরদিন থেকে—সুরমা মারা যাবার পর একদিন শুধু বাজিয়েছিলাম, তার পরদিন সন্ধ্যেবেলা—

আশা ছেলেমানুষের মত কাছে ঘেঁষিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন—সেদিন কি ছিল ?—

—তবে শোন—আবার গল্প আরম্ভ হইল—

সব কাজ শেষ হইয়াছে—ভোরবেলা শ্মশান হইতে বনমালী বাড়ী ফিরিয়া যাইবে, সমস্ত ঠিক বন্দোবস্ত হইয়া আছে। এমন সময় মাঝি আসিয়া বনমালীকে তাহার বাঁশীটি ফিরাইয়া দিয়া গেল। বনমালী ভুলিয়া আগের দিন নৌকার উপরেই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। যাক্, বাঁশীটি হাতে আসিতেই বনমালী ঠিক করিল আবার একবার সেই চরে যাইতে হইবে।

দুইজন মাঝি ছাড়া আরও দুইজন লোক চলিল লাঠি-শড়কি লইয়া। বিকাল বেলা আবার সেই চরে গিয়া তাহারা পৌঁছিয়াছে। আগের দিনের মত ঠিক সেই জায়গায় নৌকা বাঁধা হইল। সন্ধ্যা আরম্ভ হইয়াছে কি হয় নাই—এমন সময় সেই দুইটি লোককে লইয়া বনমালী চরে নামিল।

তেমনি সুরের মূর্চ্ছনায় মীড়ে তানে অপরূপ হইয়া বনস্থলী সচকিত

হইয়া উঠিল। বনমালীর বুকে যত বেদনা, যত কান্না আছে সব বাঁশীর ফুটোতে নিঃশেষে ঢালিয়া দিল—হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কে যেন বড় নিষ্করুণ ভাবে মোচড় দিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ধরণীর মাঝপথে আসিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ আসিতেছে না, তাহার পাশের দুইটি লোক দুই জোড়া সন্ধানী চক্ষু দিয়া আশেপাশে নজর দিতে লাগিল—কেহ তো আসিতেছে না। অন্ধকার তখনও তরল। সুর বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। বনমালী মরিয়া হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া একমনে বাঁশী বাজাইয়া চলিল। বাঁশী বাজিতেছে—এখনই বুঝি আকাশ গলিয়া পড়িবে—নদীর জল সমস্ত বুঝি চর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—আরও—আরও করুণ করিয়া বনমালীর বাঁশী কাঁদিয়া চলিল—

তিন জনেই দেখিল—ফল ফলিয়াছে…

সাপ আসিতেছে : বনমালীর মনে হইল যেন ঠিক সেই সাপটাই! আসিতেছে—আসিতেছে—আসিয়া পড়িল—; কিছু দূরে আসিয়া সাপ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। স্থির নিশ্চল মূর্ত্তির মত—কেবল সুরের তালে তালে যেন একটু মাথা দোলাইতেছে; উহার চোখে ঘোর লাগিয়াছে—সুরের নেশা উহাকে পাগল করিয়াছে ··

. লোক দুইটি ইঙ্গিতে পরস্পরে একসঙ্গে প্রস্তুত হইতেছিল। আর এমন সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়, লাঠি হাতে লইয়া ঠিক মারিতে যাইবে—এমন সময় বনমালী দেখিল সাপ একটি নয় দুইটি। এক জোড়া! দম্পতি উহারা! পাশাপাশি এ উহার গায়ে হেলান দিয়া রহিয়াছে। লোক দুইটিও দেখিল সাপ একটি নয় দুইটি! মারিতে হইলে দু'টিকে একসঙ্গেই শেষ করিতে হইবে। লোক দু'টি পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছে—

হঠাৎ বনমালী ইঙ্গিতে তাহাদের বসিতে বলিল।

বনমালী বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আস্তে আস্তে পিছনে হটিতে লাগিল। লোক দুইটিও সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া আসিতে লাগিল। তারপর নৌকার কাছে আসিতেই বনমালী নৌকার উপর লাফাইয়া উঠিয়াছে; লোক দুইটিও উঠিল। নৌকাতে উঠিয়া দেখা গেল—বহুদূরে সাপ দুইটি বনের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—নৌকা ছাড়িয়া দিল।—

নৌকায় উঠিয়া বনমালী একটিও কথা বলে নাই। চুপ করিয়া গলুইয়েব কাছে উদাসদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।—

লোক দুইটি বনমালীর অসঙ্গত আচরণ বুঝিতে পারে নাই। কাছে আসিয়া বলিল—কি হ'ল বাবু—মারলেন না যে?

বনমালী বলিল—ওদের কি মারতে আছে? এক জোড়া এসেছিল—ওরা যে স্বামী-স্ত্রী—

সত্যসত্যই প্রাণ গেলেও উহাদের বনমালী কখনও মারিতে পারিত না। একটি যদি আসিত তবে হয়ত মারা সহজ ছিল। কিন্তু এক জোড়া—স্বামী-স্ত্রী উহারা—জন্তু হউক আর যাহাই হউক—উহাদের মারা বড় নিষ্ঠুর কাজ। কবে এক ব্যাধ কোন এক পক্ষী-মিথুন মারিয়া ঋষিব শাপে ত' সারা জীবন ভবঘুরে হইয়া বেড়াইল—ঘর পবিবার নীড় রচিবার অধিকার তাহার জীবনে হইল না—; শেষে কি বনমালীও তেমনিই অভিশাপ কুড়াইবে, উহারা দুইজনে সুখে থাকুক—মনুষ্য-বিবর্জ্জিত দেশে উহারা স্বাধীন চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াক—মানুষ কেন উহাদের দেশে আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিবে! মানুষেরই অন্যায়—

গল্প শেষ করিয়া বনমালী চুপ করিল।

আশা বলিল—তারপর?

—তারপর বাঁশীটা নিয়ে অনেক দূরে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ; সেই থেকে বাঁশী আর ছুঁই নি—ও সর্ব্বনেশে বাঁশী আর বাজাই নি !...

ইহার পর আশা আর বনমালী দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল ! রাত্রি অনেক হইয়াছে। জলের স্রোত প্রায় স্থির হইয়া আসে আর ঘণ্টা-দুই পরেই জোয়ার আসিবে। আকাশের গায় শুক্লা-একাদশীর চাঁদ সারা নদীটিকে রুপালী পাতে মুড়িয়া দিয়াছে ; থম্‌থমে আবহাওয়া ; মাঝিরা গল্প করিতেছে আস্তে আস্তে। এধারে আশার একান্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে বনমালী। কাছাকাছি বসিয়া আছে বটে, কিন্তু মন তাহার চার বছরের উজান ঠেলিয়া বহুদূর পশ্চাতে চলিয়া আসিয়াছে !... লোকান্তরের প্রান্ত-সীমায় একটি চঞ্চলা প্রীতিমতী মুখ স্মরণ করিয়া বনমালীর বুকখানা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তবু আজ সে সুরমাকে ভুলিতে বসিয়াছে—আশা আসিবার পর হইতে সুরমাকে তাহার খুব কমই মনে পড়ে—

আশা হঠাৎ কথা বলিল—আচ্ছা, দিদি তোমাকে খুব ভালবাসতো না ?

বনমালী কি উত্তর দিত কে জানে !

হঠাৎ ওধার হইতে একজন মাঝি সুর করিয়া গান ধরিল। আগেকার সেই গানটি ! কোন্ বিরহী যেন বলিতেছে—ওগো রঙ্গিলা-নায়ের মাঝি, তুমিতো কত দরিয়া পাড়ি দাও—তুমি কি আমার বন্ধুর খবর রাখ ? যদি তাহার দেখা পাও ত' বলিও—আমি তাহার পথের দিকে চাহিয়া এখনো বসিয়া আছি—তাহাকে আমি ভুলিতে পারি নাই—আর বলিও, তাহার জন্য আমি সারা জীবন এমনই বসিয়া থাকিব—

গান শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বনমালী মনে মনে গর্জন করিয়া উঠিল, মিথ্যা কথা ! সমস্ত মিথ্যা ! কেহ কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না !...কেহ

কাহাকে চিরকাল মনে রাখে না—সবাই ভুলিয়া যায়; ভুলিয়া যায় সবাই—চোখের আড়াল হইলেই সব ভালবাসা, সব প্রেম ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুরমা যাইবার পর আশা আসিয়াছে, আশা চলিয়া গেলে আর একজন আসিবে! বিরহ মিথ্যা—প্রেম মিথ্যা—সব মিথ্যা—সব মিথ্যা—কেহ কাহারও নয়—সবাই একক—

অননুভূত এক বিচ্ছেদ-বেদনা আসিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বনমালীর সমস্ত মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

প্রেম নয়

মানুষের প্রয়োজনের হয়ত শেষ নাই। আমি দেখিয়াছি কত অদ্ভুত প্রয়োজনের তাগিদ মানুষকে পাগল করিয়া দিয়াছে। সে প্রয়োজনের কোনও মানে নাই, সাধারণের চোখে সে প্রয়োজন যেমন অর্থহীন তেমনি অস্বাভাবিক। আকাশের দিশাহীন মেঘের মত প্রয়োজন আমাদের জীবন ব্যাপিয়া বিরাজ করে—তবু জীবন যাপনের পক্ষে তাহাদের তাগিদ কত হাস্যকর! আমরা বাঁচিয়া থাকি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে নিঃশ্বাস ফেলি—মনে করি আমাদের দিন-যাপনের পক্ষে কত কিছুই অপরিহার্য্য, প্রয়োজনহীনতা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অতি সামান্য প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের জীবন কত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এমন কিছুই নয়, শুধু মাত্র একটি আরশি! রাঁচির পাগলা-গারদে আমি দেখিয়াছি একটি লোক বলে—একটা আরশি দেবেন—একটা আরশি—তার জীবন-ধারণের পক্ষে একটা আরশি যেন অনিবার্য্য! অথচ এমন কি-ই বা তার মূল্য! সেই একটা মাত্র আরশি চাওয়ার পিছনে এমন কি ইতিহাস থাকিতে পারে—একদিন আমার কৌতূহল হইয়াছিল।

রেলিঙের বাহির হইতে বলিয়াছিলাম—আরশি কি করবে?

পাগল উত্তর করিয়াছিল—মুখ দেখব। যে মুখ দেখিবার জন্য সে এত আকুল সেই মুখের দিকে চাহিলাম। অমানুষিক এক চাহনি—মুখের দুইদিকে মাংসের মত ঝুলিয়া পড়া অংশগুলি বীভৎস। দেখিবার মত এমন কিছুই তাহাতে নাই। আরশি তাহাকে দিই নাই—দেওয়া

নিষেধ বলিয়া! কিন্তু লোকটির এই অস্বাভাবিক আকাঙ্খার পিছনে যে রহস্য পুঞ্জিত ছিল তাহা আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম! সেই কাহিনীই আজ বলিতেছি—

ভূপতি নাম না হইয়া যদি তাহার নাম হইত শ্যামলাল, কি রাধানাথ, তাহাতে এমন কিছুই আসিয়া যাইত না। মোট কথা ভূপতি নিজের নাম লইয়া কোনও দিন মাথাও ঘামায় নাই। ভূপতি নামের যে একটি অর্থ আছে এবং সেই অর্থের সঙ্গে তাহার নামের সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে যে হাস্যকর ব্যাপার সৃষ্টি হয় তাহাও কোনদিন তাহার মনে পড়ে নাই। মনে পড়ে নাই তাহার নাকটা ছোট—চোখ দু'টি ঢোকা। তা সে লইয়া তাহার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। দিন তাহার চলিয়া যায়। চলিয়া যায় স্বচ্ছল গতি-প্রবাহে।

মাথা নীচু করিয়া কাজ করিতে করিতে এখন আর তাহার ভাল করিয়া সোজা হয় না। ছাপাখানার কাজে ভূপতি এখন ওস্তাদ হইয়া গিয়াছে। নিকেল করা চশমাটিকে কানের সঙ্গে আঁটিয়া ভূপতি নিজের নির্দ্দিষ্ট টুলটিতে গিয়া বসে। মাথা নীচু করিয়া অক্ষর বাছিয়া বাছিয়া কথার সৃষ্টি করে—একবার উপরের দিকে বা সামনের দিকে চাহিয়াও দেখে না। কেমন স্বচ্ছন্দ পরিবেশ—সুপরিচিত আবেষ্টনী—উদয়াস্ত দিনের সুসম্বন্ধ গতিবিধি—একটুকু বাধা কোথাও নাই। সকাল হইতে সমস্ত দিনটা কেমন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, নিশ্চিন্ত আরামে—নীরব কর্ম্মানুশীলনে। রাত্রি আটটায় ছাপাখানা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপতি ওঠে—চশমাটি খুলিয়া পকেটে রাখে—হাত, মুখ ধুইয়া—চটি জুতা জোড়া পায়ে গলাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে।

রাস্তায় বাহির হইতেই নিতাই পিছনে আসিয়া বলিল—পান খাবে ভূপতি দা? ভূপতি তখন দক্ষিণমুখো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বলিল—দূর, নেশা-টেশার মধ্যে আমি নেই—ওতে কেবল পয়সার শ্রাদ্ধ।

ছোট বেলায় ভূপতি একবার বিড়ীর নেশা করিয়াছিল। দূর সম্পর্কের এক কাকার বাড়ীতে থাকিত, খাইত, সংসারের কাজ করিত আর অবসর মত লেখাপড়া করিত;—সেই সময়ে গোপনে দুই একটা বিড়ী সে টানিয়াছিল। কিন্তু কাকার এক প্রচণ্ড চাঁটিতে সে নেশা সেই যে ছাড়িয়া গেল আর ধরিবার অবসর পায় নাই।

শুধু বিড়ীই না, ছোট-বড় করিয়া চুল ছাঁটা, লম্বা ঝুলের কাপড় পড়া, এবং চুলগুলিকে সুবিন্যস্ত করিয়া টেরী-কাটা আর পান খাওয়া—এ সবই কাকা ভীষণভাবে বারণ করিয়া দিয়াছিল। কাকার নিষেধ ভূপতি মন দিয়া শুনিয়াছিল। তবে এখন ভূপতির সব অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর চেষ্টা করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় না! ভূপতির মনেই পড়েনা আরশিতে কতদিন মুখ দেখা হয় নাই। চুলে হাত দিয়া ভূপতি বুঝিতে পারে টাক এখনও পড়ে নাই।

পিঠের দিকের একটা আলমারীর গায়ে পেরেক ছিল। অসাবধানে বসিতে গিয়া জামার একটি দিক তাহাতে লাগিল—লাগিয়া ছিঁড়িয়া গেল। নিতাই পাশে ছিল। দেখিতে পাইয়া বলিল—এ হে হে—গেল—ছিঁড়েচে—কাজ করিতে করিতে ভূপতির মাথা তুলিতে নাই। বলিল—আর একটা তালি দিলেই চলবে—জামাটা নতুনই—

নিতাই হাসিল। বলিল—কটা হোল?

ভূপতি বুঝিতে পারে নাই। বলিল—কি ক'টা হোল?

—এই জামার তালি।—

ভূপতি বলিল—তুই কাজ কর দিকিনি, নিজের কাজ,—পাঁচ লাইনের একটা কপি নিয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে দিলি—কেবল কথা—

রাত্রে মেসের ঘরে আসিয়া ভূপতি বিছানার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে না—কিম্বা কলতলায় গিয়া চৌবাচ্চার জলে স্নান করিয়াও ফেলে না। কিছুই করে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যাহা করা উচিত তাহার কিছুই ভূপতি করে না। কুলুঙ্গি হইতে একটা শিশি পড়িয়া দুই পায়ে বেশ করিয়া তেল মাখিতে থাকে। সরিষার তেল। মশার উপদ্রব হইতে রেহাই পাইবার এমন অব্যর্থ প্রতিষেধক আর নাই কিন্তু।

শুইবার আগে ভূপতি এটা ওটা নড়িয়া চড়িয়া রাখিল। দরজায় খিল দিল। তারপর নজর পড়িল তক্তপোশের ঠিক উপরে টাঙানো একটি ছবির উপর। ঠিক ছবি নয়—ক্যালেণ্ডার। বছর তিন চার পূর্ব্বের ক্যালেণ্ডার—কে যে কবে টাঙাইয়া ছিল তাহা মনে নাই। তবে নির্দ্ধারিত সময়ের শেষে ওটি আর ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই। ছবিখানি এমন কিছুই নয়—কদম্বমূলে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মান করিয়া বসিয়া আছেন রাধা—আর তাহারই সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীটি লইয়া রাধার পায়ের কাছে উৎসর্গ করিতেছেন। পিছনে একটি পুচ্ছ-বিস্তৃত ময়ূর। ছবির বিষয়-বস্তু এই। কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে কোন এক ঔষধ বিক্রেতার বিজ্ঞাপনের সুবিস্তৃত বিবরণ জার্ম্মানীতে ছাপা, এই ছবিটি লইয়া ভূপতি কোনও দিন মাথা ঘামায় নাই। তবে চারিপাশের ছাপা বিষয়বস্তুর উপর ভূপতি অনেকবার চোখ বুলাইয়াছে। যে যাহাই বলুক ছাপার মধ্যে ভূপতি বহু দোষ-ত্রুটি বাহির করিয়া ফেলে। জার্ম্মাণীতে ছাপা হইলেই একেবারে সাত-খুন-মাপ হয় না।

কথায় কথায় সকলকে শুনাইয়া ভূপতি বলে—সায়েবদের ছাপার মধ্যেই হাজর গণ্ডা ভুল বের করে দিতে পারি—সায়েব বলেই কি পীর নাকি ?

ভূপতির কথার কেহ প্রতিবাদ করে না। করিলে ভূপতি নিজেই দেয়াল হইতে সেই পুরাতন ঔষধ বিক্রেতার ক্যালেণ্ডারটি পাড়িয়া আনিয়া দেখাইত। বলি দেখে যাও—সায়েব হলেই পীর হয় না আর—কিন্তু সে যা হোক—ভূপতির দিন চলিয়া যায়—চলিয়া যায় স্বচ্ছল গতি প্রবাহে।

দক্ষিণের জানালা দিয়া যেদিন হুহু করিয়া হাওয়া আসে, ভূপতি সর্দ্দি হইবার ভয়ে জানালাটি বন্ধ করিয়া দেয় ! শীতকালে বেশ করিয়া আপাদ-মস্তক মুড়িয়া ভূপতি কাজ করিতে যায়, আবার ফিরিয়া আসে সেই ভাবে। হঠাৎ দেখিলে বিশেষ পরিচিত লোকও চিনিতে পারে না।

কোন গলি দিয়া ঢুকিয়া, কোন রাস্তায় পড়িয়া, কোন চৌমাথা পার হইয়া—কোথায় কাহার দোকানের পাশ দিয়া দু'মাইল হাঁটিয়া ভূপতি ছাপাখানায় গিয়া ঢোকে ! নিতান্ত পরিচিত পথ—বিরাট পৃথিবীর সঙ্গে কেবল তাহার এই পথেরই পরিচয়। মাথা নীচু করিয়া কাজ করিতে করিতে ভূপতি এখন রাস্তা দিয়া হাঁটে তাও মাথা নীচু করিয়া। একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, মটর আসিয়া ঘাড়ে পড়িতে পারে, পারে বৈকি !

অন্ধকার রাস্তার একপাশ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ভূপতির মনে হয় ছাপার কথা ! সায়েব কোম্পানীতে কাজ করিয়া সুখ আছে যা হোক ! সাহেবরা ·গুণের কদর বোঝে। বেলসন্ কোম্পানীর বড় সায়েব বলিয়াছেন—আমি যতদিন আছি ভূপতিবাবু, ততদিন তোমার ভাবনা নাই। ভূপতিরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভাবনা হইল সায়েব যাইবার

পর। একদিন সায়েব বুকে গুলি মারিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিল। নিজে নিজে মরিল কিন্তু ভূপতিকেও মারিয়া গেল। রাম না থাকিলে রাম-রাজত্বও থাকে না। না থাকুক—ভূপতির তাহাতে এমন বিশেষ কিছুই আসে যায় না। ছেলেমেয়ে নাই, পরিবার নাই। তাহার আবার ভাবনা কি ? একটি মাত্র পেট চলিয়া যাইবেই। সেই যে কথায় আছে—জীব দিয়াছেন যিনি আহার…

এমনি করিয়াই ভূপতির দিন কাটিতেছিল। কিন্তু প্রথম বাধা আসিল একদিন রাত্রে। ভূপতির জীবনে সে দিনটি অক্ষয় হইয়া আছে। তাহার কুমার জীবনের প্রথম স্খলন। আদিম মানবের প্রথম পাপ! সে পাপ এখন তাহার জীবনে জড়াইয়া গিয়াছে।…

মাথা নীচু করিয়া ভূপতি আসিতেছিল।

রাত্রের অন্ধকারে রাস্তার এক পাশ দিয়া ভূপতি আসিতেছিল।…

যেমন করিয়া আর পাঁচ জনে আসে তেমন করিয়া নয়—ভূপতি আসিতেছিল মাথা নীচু করিয়া—

হঠাৎ সম্মুখ হইতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। একটি লোক সাইকেল লইয়া আসিয়া পড়িল একেবারে ভূপতির শরীরের উপর।

আচমকা আঘাত—ভূপতি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। তা যাক্ বেশি লাগে নাই। আবার উঠিয়া ধূলা বালি ঝাড়িলেই সব বেদনা চলিয়া যায়। সাইকেলের তলায় চাপা পড়িলে এমন কিছু লাগে না। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটিল অন্য রকম।

পড়িয়া যাইতেই ভূপতির কানে গেল যেন কাহার উচ্ছ্বসিত হাসি।

উঠিয়া ভূপতি দেখিল—তাহার কিছু দূরেই একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। হাসিটা তাহাকে দেখিয়াই, ভূপতি আবার

তাহার দিকে চাহিল—একটি মেয়ে—নিতান্ত কুৎসিত—কুৎসিত তাহাকে বলা যায়—কিন্তু রূপসী হইবার চেষ্টা আছে। রীতিমত সাজগোজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রূপ-যৌবনের পসরা খুলিয়া পণ্য সাজাইয়াছে। কিন্তু মানায় নাই—যে ভূপতি কোনও দিন কোনও কিছু লইয়াই মাথা ঘামায় নাই—ভাল-মন্দর তফাৎ যে করিতে পারে না—চোখ তুলিয়া কোনও মেয়ের দিকে যে একবার চাহিয়াও দেখে নাই—সেই ভূপতিরও মনে হইল যেন তাহাকে মানায় নাই। ওই সাজ-পোষাক, জাঁক-জমক তাহাকে যেন সাজে না।

লজ্জায় ভূপতির নীচু মাথাটা আরও নীচু হইয়া গেল।

একটা কুৎসিত মেয়েমানুষও তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির! সাইকেলে চাপা পড়িবার মধ্যে হাসির কি আছে? তাহার চেহারা দেখিয়া হাসিল, না সাইকেল চাপা পড়িয়াছে বলিয়া হাসিল—কে জানে!

মেসে আসিয়া ভূপতির মনটা একটু চঞ্চল হইয়া রহিল।

আজই প্রথম ভূপতি নারীর দিকে চোখ মেলিয়া চাহিল। তক্তপোশের উপর সেই দেয়ালের সেই ক্যালেণ্ডারটির দিকে চাহিল। ছাপা কথাগুলির দিকে নয়—ছবিটির উপর। শ্রীকৃষ্ণ রাধার পায়ের কাছে হাতের বাঁশীটি উৎসর্গ করিতেছেন। মনে হইল—উহার মধ্যে এক নতুন রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে।

কথাটা সকাল বেলা আর মনে থাকিবার কথা নয়। খাইয়া উঠিয়া ছুটিতে ছুটিতে কাজে যাওয়া—কোনও দিকে দৃকপাত করা নয়। কোনও রকমে ঠিক সময়ে গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া। কিন্তু রাত্রে আসিবার সময় হঠাৎ দেখা হইয়া গেল আবার—চোখ পড়িয়া গেল। পড়িতেই দেখে—সেই জায়গাটিতে ঠিক

তেমনি করিয়া হাসিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে—চোখে চোখ রাখিয়া—

ভূপতি সারা শরীরে এক অননুভূত চেতনা অনুভব করিল। শিরায় শিরায় যেন কে সঞ্চরণ করিতেছে। মৃদু শিহরণ—সারা গা বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে। প্রতি রোমকূপে যেন অভূতপূর্ব্ব জাগরণ। পায়ের তলায় পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে। কী এক আবেশ। ঠিক বুঝা যায় না—বুঝান যায় না। ভূপতির সারা দেহে সারা মনে এক অদ্ভুত আলোড়ন সুরু হইল।

ভূপতির মনে হইল তাহার জ্বর হইল নাকি? কপালে হাত দিয়া ভাল করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল—যেন গরম বোধ হইতেছে। এমন কখনও তাহার হয় না। শরীর তাহার কখনও খারাপ হ'ল না। ভূপতির মনেই পড়ে না কবে তাহার অসুখ হইয়াছিল—তাহাকে শয্যাশায়ী হইয়া কখনও পড়িয়া থাকিতে হয় নাই। ছাপাখানায় তাহার একটি দিনের জন্যও কামাই কখনও হয় নাই। স্বাস্থ্য তাহার চিরকালই সুস্থ। কিন্তু আজ এ তাহার কি হইল?

রাত্রে মেসে গিয়া ভূপতি ভাত খাইল না। একটা দিন উপবাস দিলে শরীর ভাল থাকিতে পারে। তারপর জানালা দরজা চারিদিক ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সারারাত ভাল করিয়া ঘুম হইল না। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে যেন কে বারে বারে আসিতে লাগিল। এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে ভোর বেলার দিকে তন্দ্রা আসিয়াছিল। —সে ঘুম ভাঙ্গিল দেরিতে! ভূপতি উঠিল—কিন্তু রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি যেন তাহার সমস্ত শরীরে জড়িত।

ছাপাখানায় গিয়া মনোযোগ দিয়া কাজ করিয়া তবে যেন ভূপতির

একটু শান্তি আসিল। রাত্রিবেলা চশ্‌মাটি খুলিয়া চটি-জোড়া পায়ে দিয়া ভূপতি আবার রাস্তায় নামিল। আজ একেবারে সোজা গিয়া বিশ্রাম। তক্তপোশের উপর গিয়া শুইয়া পড়া।

কিন্তু কি জানি কি হইল—সেই জায়গাটিতে আসিয়া ভূপতি চোখ তুলিয়া চাহিতেই আবার চোখে পড়িল—তেমনি কুৎসিত হাসি। কুৎসিত হোক্—তবু ভূপতির শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। আবার তেমনি রোমাঞ্চ—তেমনি করিয়া শিহরণ—দেহ গরম হইয়া উঠিল। ভূপতি চোখ বুজিয়া একমিনিট কি ভাবিল, তারপর নিজের পথেই চলিতে যাইবে এমন সময় ভূপতির মনে হইল যেন মেয়েটি তাহাকে ডাকিতেছে—রাস্তা ছাড়িয়া ভূপতি একেবারে তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। অন্য কোনও দিকে তখন তাহার জ্ঞান নাই। ছাতাটা কাঁধ হইতে নামাইয়া ভূপতি প্রথমে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কথা যেন তাহার হারাইয়া গিয়াছে। মেয়েটির কিন্তু লজ্জা নাই—মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতেছে—

ভূপতি বলিল—হাস্‌ছ যে? হাসছ কেন, শুনি?

মেয়েটি হাসি থামাইয়া বলিল—তোমাকে দেখে।

—আমাকে দেখে?—প্রশ্ন করিল ভূপতি; তাহার পর নিজের চেহারার দিকে একবার চাহিয়া লইল। তাহাকে দেখিয়া হাসিবার কি থাকিতে পারে? আর পাঁচজন যেমন সে-ও তো তেমনি। ভাল করিয়া চাহিতে ভূপতির নজরে পড়িল—সত্যই তো, কাপড়টা ময়লা—বাহির হইতে সেলাইগুলি দেখা যায়। হাঁটুর উপর উঠিয়াছে। জামায় তালির উপর তালি—বিশেষ করিয়া সেদিন পেরেক লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, সে আর সেলাই করা হয় নাই। চারিদিকে দৈন্য! নিজের

দৈন্য দেখিয়া ভূপতির আজ নিজেরই লজ্জা হইতে লাগিল। মনে হইল—সে যদি এখনই নিজেকে লুকাইয়া ফেলিতে পারিত—। ভূপতি চলিয়া আসিতেছিল—

মেয়েটি ডাকিল—

ভূপতি আবার ফিরিল—কি ?

ঘরে চল না—বসবে—

ভূপতি বলিল—চল। মেয়েটির পিছন পিছন ভূপতি চলিতে লাগিল—

কিন্তু গলিটার ভিতর ঢুকিতেই ভূপতির হঠাৎ গ্যাসের আলোয় তাহার পোষাকের দৈন্য ভাল করিয়া আবার নজরে পড়িল। শতচ্ছিন্ন জামা কাপড় আজ যেন প্রথম তাহার চোখে প্রকট হইল। মেয়েটির রঙ-চড়া শাড়ীর কাছে তাহাকে বড় করুণ দেখাইতেছিল।

মেয়েটি আগে আগে চলিতেছিল—ভূপতি নিঃশব্দে পিছন দিকে ফিরিল। তারপর হন্ হন্ করিয়া সোজা একেবারে রাস্তায় আসিয়া নামিল। আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই—একেবারে মেসে গিয়া উঠিতে পারিলে হয়।

নিজের ঘরে গিয়া ভূপতি দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া দিল। খুলিতেই হুহু করিয়া বাতাস আসিয়া ভূপতির চোখে মুখে লাগিল। ভূপতির মনে হইল—এতক্ষণে যেন সে সজীবতা পাইয়াছে।

এমন করিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া ভূপতি আগে কখনও দেখে নাই। বিরাট পৃথিবীর দিকে আজ ভূপতি মুখোমুখি চাহিয়া রহিল। চাঁদ উঠিয়াছে—সারা আকাশটা আলোয় আলো। এদিকটা শহরতলী। টিম্ টিম্ আলো—আকাশ দিগন্ত ব্যাপিয়া বনের শ্রেণী। শহরের শেষের

ক্ষীণায়মান কোলাহল ভূপতির কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। অন্ধকারের অভ্যন্তরে যেন কোন রহস্যলোক অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ভূপতি বঞ্চিত—ভূপতির সমস্ত ইন্দ্রিয় বঞ্চিত। এতদিন কেবল কোনও রকমে দিনাতিপাত করিয়াছে।—তাহার মধ্যে না ছিল রঙ্ না ছিল রস। শুষ্ক কঠিন মরুভূমির উপর শুধু কোনক্রমে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

প্রাণ-ধারণের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত সে কিছুই করে নাই। এই পৃথিবীতে দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্য আছে, নারীর মোহণীয়তা আছে, সে কথা কে ভাবিয়াছিল।

বিছানায় শুইয়া রাস্তার মেয়েটিকে তাহার মনে পড়িল। হাসিয়াছে সে। সেই হাসিটি ভূপতি একবার মনে করিতে চেষ্টা করিল। তাহার জামা কাপড় দেখিয়া হাসিয়াছে। তাহার দারিদ্র্য দেখিয়া হাসিয়াছে—তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া? ভূপতির মনে হইল প্রতিশোধ লইতেই হইবে। তাহাকে ভূপতিও দেখাইবে। ভূপতিও ইচ্ছা করিলে বাবুয়ানা করিতে পারে কিনা তাহাকে তাহা দেখাইবে।

তার পরদিন হইতে সে-রাস্তা দিয়া ভূপতি আর যায় না। অনেক ঘুরিয়া অনেক সময় নষ্ট করিয়া ভূপতি কাজ করিতে যায়। তা'হোক যেদিন সময় হইবে সেদিন দেখাইবে তাহাকে। চোখে তাহার ধাঁধা লাগাইবে।

সেদিন নিতাই পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিয়াছে। প্রথম চিনিতেই পারে নাই। বলিল, আমাদের ভূপতি দা' না?

ভূপতি হাসিয়া বলিল—জামাটা কেমন হয়েছে বল দিকি? দু'টাকার কমে ছাড়লে না—

নিতাই বলিল—এইবার কিন্তু বেশ মানিয়েছে তোমাকে—একটা বিয়ে করে ফেল—

ভূপতি সে কথায় কান না দিয়া বলিল—এইবার একটা কাপড় আর এক জোড়া জুতো হলেই বাস—কি বল?

একটা কাপড় আর এক জোড়া জুতো—কিন্তু তাহাই কি অত শীঘ্র হয়?

প্রথম মাসটা কাটিয়া গেল—মেসের দেনা দিতে—এটা-ওটা করিতে করিতে। কাপড়টা আর সে মাসে হইল না। পরের মাসে হইবে। কিন্তু সে মাসটাও টাকাগুলা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল—ঠিক নাই। কাপড় কেনা হইল না।

অনেক দিন পরে কাপড় হইল—একখানা নয়—একেবারে এক জোড়া।

অনেক দিন তাহার সঙ্গে আর দেখা নাই। প্রথম যে দিন সাজ-গোজ করিয়া ভূপতি যাইবে, সেদিন প্রথম তাহার চোখে বিস্ময় লাগাইবে। নিশ্চয় আশ্চর্য্য সে হইবেই!

একদিন যাহাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল—বিদ্রূপের হাসি, একদিন যে করিয়াছিল কৃপা-কটাক্ষ—সে তাহাকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া ডাকিবে, অভ্যর্থনা করিবে।

ভূপতি নিজের ঘরখানার চারকোণে চাহিয়া দেখে। এর আগে এতদিন তো এসব চোখে পড়ে নাই। এই জঞ্জাল—অপরিচ্ছন্নতা! নিজেকে যেন তাহার দয়া করিতে ইচ্ছা হয়। দক্ষিণের জানালাটা দিয়া

যখন খোলা আকাশটা দেখা যায়—আকাশের উপর খণ্ড চাঁদের আলো ঘরের ভিতর আসিয়া পড়ে, আর রাত জাগা কোনও পাখীর সঞ্চরমান ডাক যখন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিধ্বনি করিয়া ফেরে—ভূপতির কেমন এক অহেতুক আনন্দ বোধ হয়। এই পৃথিবীতে এত স্বাদ আছে—এত গন্ধ আছে, এত আশা আছে। এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া এত সুখ আছে! রাস্তায় চলিতে চলিতে ভূপতি আজকাল চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে। বিচিত্র মানুষের সমারোহ—বিচিত্র জীবনের জনতা। সকলের চোখে কি রহস্য—কি অস্পষ্টতা—কী মাধুর্য্য! মানুষের চোখের ভাষা কত অদ্ভুত! কেহ কাহাকে চেনে না—অথচ কত সামঞ্জস্য—কত আত্মীয়তা। ভূপতি এত কথা কোনদিন ভাবে নাই। কিন্তু নিজের মনে রাস্তা চলিতে চলিতে হাজার হাজার কথা তাহার মনে আসে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে—তাহার নারীকে। নারী দেখিলে ভূপতির চোখ আর ফিরিতে চায় না। মনে হয়, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জীবনটা কাটাইয়া দেয়। পৃথিবীতে এমন জিনিষও আছে। নারী দেখিলে ভূপতির সমস্ত শরীরে মৃদু শিহরণ খেলিয়া যায়। এতদিন ধরিয়া বঞ্চিত থাকিয়া আজ যেন ভূপতি নূতন চেতনা লাভ করিয়াছে। ভূপতি নূতন করিয়া যেন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল।

ছাপাখানা হইতে সকাল সকাল বাহির হইয়া ভূপতি আসিয়া রাস্তায় নাবিল।

পৃথিবীকে আজ যেন বড় নূতন ঠেকিতেছে। নিজেকেও তাহার এত ভাল কোনও দিন লাগে নাই। নিজের চারিপাশে যাহাকে ভূপতি দেখিতেছে সবাই যেন আজ নূতন। এই রাস্তা দোকান-পাট আজই যেন সব সৃষ্টি। এত আনন্দ পৃথিবীতে আছে।

আসিতে আসিতে ভূপতি অনেক দিন পরে সেই পুরাতন রাস্তায় আসিয়া পড়িল। সেই সব তেমনি আছে—সব তেমনি। কিন্তু তবু সবই যেন নূতন বলিয়া চোখে লাগিতেছে। ভূপতি রাস্তার মোড় হইতে ফুল কিনিল—তাহার চুলে পরাইয়া দিবে।

দূর হইতে দেখা যায়—মেয়েটি সেখানেই তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

ভূপতি আস্তে আস্তে গিয়া সামনে দাঁড়াইল! মেয়েটি চিনিতে ঠিক পারে নাই। না পারিবারই কথা। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ জুতা জামা সমস্ত মিলিয়া ভূপতি যেন নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চিনিতে পারিয়াই হাসি। কিন্তু এ-হাসি নারী-সুলভ হাসি।

ভূপতি বলিল—চিনতে পার?

মেয়েটি উঠিয়া বলিল—এস, ঘরে চল—অনেক দিন যে তোমার দেখা নাই—

ভূপতি কোন উত্তর দিল না—সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় রক্তের চলাচল সে শুনিতে লাগিল! এত আনন্দও আছে পৃথিবীতে—এত স্বাদ, এত গন্ধ! ভূপতির বুকের ভিতর নূতন আবিষ্কারের আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘরে গিয়া ভূপতি বিছানার উপর বসিল। একখানি ঘরের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সংসার। আলমারীর কাচের ভিতর খেলনা পুতুল। দেয়ালে ছবি। ভূপতির চোখে এমন সংসারের চিত্র নিতান্ত নূতন।

হঠাৎ কি হইল কে জানে! ওদিকের দেয়ালে একটা মস্ত বড় আরশি টাঙানো ছিল। ভূপতি গিয়া সামনে দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই নিজের

প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভূপতি চমকিয়া উঠিল ! এ কী ? ভূপতি আরশির কাছে মুখ আনিয়া অধীর আগ্রহে দেখিতে লাগিল। এ কী ? নিজেকে যেন ভূপতি চিনিতে পারিল না। এ কী ? এ তাহার কি হইল ? চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—এই কি সে নাকি ? ভূপতি আরো কাছে মুখ আনিয়া ভাল করিয়া দেখিল—চুল তাহার পাকিতে সুরু হইয়াছে—মুখের দুইপাশের চামড়া ঝুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কপালে রেখা পড়িয়াছে ! কোথায় গেল যৌবন। যৌবন তাহার কোথায় গেল ? কোথায় গেল··· ভূপতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তারপর কি হইল কে জানে ?

সেই ঘরের ভিতর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কান্না আর থামিতেই চাহে না।

মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। এমন অদ্ভুত মানুষ সে দেখে নাই কোনও দিন।

ভূপতি আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। উঠিয়া আর একবার নিজেকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। এতদিন ত' কই নজরে পড়ে নাই ? তারপর—তারপর যেন পাগলের মত ঘরে যা কিছু ছিল সব দুম-দাম করিয়া আরশির উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল।

মেয়েটি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কথা কে শোনে—ভূপতি ঘটি বাটি সব ছুঁড়িয়া কাচের উপর মারিতে লাগিল।···যখন আর কিছু নাই—সেই ভাঙা কাচের উপর ভূপতি দুই হাতে ঘুষি মারিতে লাগিল।

—মিথ্যাবাদী—আরশি মিথ্যাবাদী !

রাঁচীর পাগলা-গারদে রেলিঙের ভিতর হইতে একটি পাগল বলে—একটা আরশি দেবেন একটা আরশি—

ও সেই ভূপতি। ভূপতিকে তোমরা আরশি দিও না। আরশি দিলে ভাঙ্গিয়া হাত পা কাটিয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিবে!...যে মুখ দেখিবার জন্য সে অত ব্যস্ত—সে মুখ এখন আরো বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে—এখন আর সে ভূপতি নাই—তবু যাহাকে দেখে তাহাকেই বলে—একটা আরশি দেবেন—

ভূপতিকে আরশি দেওয়া নিষেধ।

ইতি।